নাদ ব্রহ্ম

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

সহযোগিতা ঃ- অনির্বাণ, দেবতনু

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ রাখী পূর্ণিমা, ১৪১৭ ২৪শে, অগষ্ট, ২০১০

মুদ্রণ -- মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট কোলকাতা - ৭০০০০১

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
''অভিনব দর্শন''
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
Website : www.avinabadarshan.com (Free Site)

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
৩) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

একটি শিশু ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে বহন করে নিয়ে আসছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের (মহাশূন্যের) এক অমোঘ বার্তা। এই বার্তাটি নাদধ্বনি বা নাদবন্ধ নামে অভিহিত। এই নাদধ্বনি হতেই জগতের সৃষ্টি। প্রতিটি জীবের দেহযন্ত্রের সপ্তচক্রের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মহা নাদধ্বনি সুরে সুরে গাঁথা আছে। তাই হাজার হাজার বছর আগে সুরঞ্জরা, বেদজ্ঞরা বুঝেছিলেন যে, এই দেহবীণাযন্ত্র বাজালে (সাধনা করলে), তবেই জানা যাবে সৃষ্টি রহস্যে জীবের পরিচয়; অর্থাৎ কেনই বা জন্ম, কেনই বা মৃত্যু, এর আগে কোথায় ছিলাম, আদৌ ছিলাম কিনা ইত্যাদি। তাই প্রকৃতির ধারাবাহিকতার ধারায় মহানাদের ধ্বনিতে সুর দিলে, আপনি খুলে যাবে সৃষ্টির অপার রহস্যের দরজা।

সবকিছুর মূলেই রয়েছে সুর বা নাদধ্বনি। নাদই চৈতন্য, যার দ্বারা সবকিছুর সৃষ্টি। অতি সহজেই যাতে জীব আদিসুরকে বা নাদব্রহ্মকে সুরে আনতে পারে, তারজন্যই সাধু, ঋষি, মহানরা আবহমানকাল হতে নিজ নিজ মাত্রা অনুযায়ী কেউ প্রথম সিঁড়ির সুর সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং প্রথম সিঁড়ির সিদ্ধিলাভের ফল মন্ত্র হিসাবে ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে বিলাচ্ছেন। কেউ বা আবার জন্মগত সিদ্ধ হয়ে ২৫ হাজার সিঁড়ির উপরের মন্ত্রের সারবস্তু সবার মধ্যে বিলাচ্ছেন।

প্রথম সিঁড়ির মন্ত্রে কেউ বনের সাপকে ছুটিয়ে আনছেন। কেউ বা প্রখর খরায় বৃষ্টি আনছেন। কেউ আবার মন্ত্রের মাধ্যমে আগুন জ্বালাচ্ছেন, বৃষ্টি থামাচ্ছেন। আর ২৫ হাজার সিঁড়ির উপরের মন্ত্রে যাঁরা বলীয়ান, তাঁদের কাছে সৃষ্টির অপার রহস্যের দরজা উন্মুক্ত হয়েই আছে। কারণ ২৫ হাজার সিঁড়ির উপরের স্তরের বার্তা ব্রহ্মহাটের বার্তা, মহাকাশের বার্তা। সেখান হতেই জগতের সৃষ্টি।

আমাদের দেহযন্ত্রের মধ্যে কোটি কোটি জীব আছে, কোটি কোটি অণু-পরমাণু আছে। প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু মধ্যেই আমাদের মতো ব্যক্তিত্ব আছে, চৈতন্য আছে, জ্ঞান ও বুঝ আছে। তারাও দর্শন ও মুক্তির কামনা করে। তাই অজস্র নাদের ধ্বনি বা নামের ধ্বনি না দিলে, ভিতরের লক্ষ কোটি জীব কণিকাগুলি মুক্তির স্বাদ পাবে না। এর জন্যেই বেশী করে নাম ও জপের প্রয়োজন। নাদধ্বনি থেকেই শব্দের আকারে নাম ও মন্ত্রের সৃষ্টি।

এই জগতের কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। ক্ষণিকের তৃপ্তিতে, ক্ষণিকের আনন্দে, ক্ষণিকের মোহে উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছে সবাই। সেই ক্ষণিকের তৃপ্তিতে তৃপ্ত হবার জন্য জীবকুল আজ দিশেহারা। তারজন্যই যত ভুল বোঝাবুঝি, ছল-চাতুরী, কলকৌশল, মারামারি, হানাহানি, খুন জখম ইত্যাদি হয়ে চলেছে। এর থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে, মহানামের সাধনা বা মহানামকে সম্বল করে পথ চলা।

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বুঝেছিলেন, জীবের একমাত্র মুক্তির পথ অন্তর্নিহিত রয়েছে নাদব্রহ্ম বা মহানাম সংকীতনের মধ্যে। তাই তিনি মহাকাশের দিকে তাকিয়ে, দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলে ছুটে চললেন, ১৬ নাম ৩২ অক্ষর 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম' মহানামের ঝড় তুলে, প্রেমোন্মত্ত হয়ে জীবকুলকে দিব্য জীবনের আলোর পথ দেখানোর লক্ষ্যে।

মহাপ্রভু সেদিন দিয়েছিলেন মহানাদধ্বনি মহানাম ''হরেকৃষ্ণ হরেরাম।'' তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ রক্ত হিসাবে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ জীবের উদ্ধারকল্পে দিলেন এযুগের যোগ্যনাম ''রাম নারায়ণ রাম।''

''রাম নারায়ণ রাম'' এই নামের সুর অসীম অনন্ত স্বচ্ছতায় ভরা। অনন্ত মহাকাশের মহাশক্তির গুণ, মহা সুরের স্বরগ্রাম হিসাবে এই ''রাম নারায়ণ রাম'' মহানাম ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই মহাকাশের মহাশক্তির সুরে তন্ময় হয়ে থাকলে, এই জগতের সমস্ত সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তাই তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) জীবের উদ্দেশ্যে বললেন, ''অনন্ত মহাশূন্যে সাধু গুরু বলে কেউ নেই। সবাই এখানে পথিক, সবাই যাত্রিক। আমি শুধু সেখান থেকে মহানাদের ধ্বনি কুড়িয়ে এনে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিলাম। জীবন অবসান হয়ে যাচ্ছে। সূর্য অস্তগামী। হে পথিক, অনন্ত পথের যাত্রিক, ভুল করো না। ভুল বুঝো না। সময় যে আর নেই। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। নিজের নিজের পাথেয় সঞ্চয় করে নাও। সর্বদা খেয়াল রাখবে, 'পৃথিবী হচ্ছে অতিথিশালা' আর এই সংসার 'তৈরী হবার জন্য।' অহর্নিশ মূল মন্ত্র স্মরণ করতে করতে চৈতন্যের দ্বার যেদিন খুলে যাবে, সেদিন সেই মহাচৈতন্যকে উপলব্ধি করে, তোমার সকল চাওয়া পাওয়ার পরিসমাপ্তি ঘটবে।''

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনও ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। সেই সকল অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের **৩২-তম শ্রদ্ধার্ঘ্য** প্রকাশিত হলো **'নাদব্রহ্ম'**।

পরিশেষে জানাই, পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, যে সকল ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ রাখী পূর্ণিমা, ১৪১৭ — *চপল মিত্র*

ইং ২৪শে অগষ্ট, ২০১০ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

ধ্বনি হতেই জগতের সৃষ্টি। আর স্রষ্টার সাথে তিনিই যুক্ত হতে পারেন, যিনি এই ধ্বনিকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারেন।

সুখচরধাম
১৪ই জানুয়ারী, ১৯৮৮

টাকা বা donation নিয়ে আমি কিছুই করি না। ২০০ ছেলেমেয়ে মিলে সুখচরে থাকি আমরা। রাজমিস্ত্রি, কাঠের মিস্ত্রি থেকে শুরু করে সব মিস্ত্রি আছে এখানে। নিজেরা ইট ভাঙি, নিজেরাই গড়তে গড়তে চলেছি। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নয়। এই সমাজের বুকে একশ্রেণীর ব্যক্তি গুরুগিরির ব্যবসা করে যাচ্ছে বলেই আজ সমাজ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছি বলেই অনেক ঝড়ের বিরুদ্ধে আমাকে লড়াই করতে হচ্ছে। তাই **আজকের দিনে যে পরিস্থিতি এসে দাঁড়িয়েছে, এই পরিস্থিতিতে ভীষণভাবে রোলার না চালালে এইগুলো শায়েস্তা হবে না। রোলার রাস্তার সবকিছু তছনছ করে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। সব মিশিয়ে দিয়ে রাস্তা তৈরী করে। তবে আমি যে রোলারের কথা বলছি, এই রোলার মারপিটের রোলার নয়।**

সেই রোলার নামের রোলার, ধ্বনির রোলার, শব্দ ব্রহ্মের রোলার, বেদের রোলার। সেই বেদ এই হৃদযন্ত্রে; দেহবীণাযন্ত্রে সেই সুর গাঁথা আছে। তাই সুরজ্ঞরা, বেদজ্ঞরা, বেদের পূজারী যাঁরা তখন ছিলেন, তাঁরা কি করতেন? হাজার

হাজার বছর আগে তাঁরা বুঝেছিলেন এই যন্ত্র, এই দেহবীণাযন্ত্রটা বাজাতে হবে। সা রে গা মা পা ধা নি- এই কয়টা দিয়ে যেমন সুর সাধনা করে, সেইরকম সুর এইটার মধ্যেও আছে, এই দেহের মধ্যেও আছে। সেই সপ্ত সুর হ'ল মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার। সা রে গা মা পা ধা নি। সা রে গা মা পা ধা নি-র মতন অনন্ত সুরধ্বনি অন্তর্নিহিত আছে দেহবীণাযন্ত্রে। এই যে সা রে গা মা পা ধা নি- এটা হল এখানকার প্রথম সিঁড়ির কথা। এইরকম **প্রথম সিঁড়ি, দ্বিতীয় সিঁড়ি, তৃতীয় সিঁড়ি বলতে বলতে আমি যে সিঁড়ির কথা বলছি, সেটা হ'ল ২৫ হাজার সিঁড়ির কথা। এই ২৫ হাজার সিঁড়ির স্তর পার হতে গেলে যেভাবে যেতে হয়, সেই স্তর, সেই সিঁড়ি, সেই সা রে গা মা-র কথা বলছি।**

প্রথম সিঁড়িতেই বনের সাপ ছুটে আসে মন্ত্রে। নখদর্পণে দেখা যায়, বাটি চালানে কথা বলে। আরও কত কি হয়। কত মন্ত্রে কতরকমের ব্যবস্থা আছে। প্রথম সিঁড়ির মন্ত্রেই কত কিছু হয়। দ্বিতীয় সিঁড়িতে তারচেয়ে বেশী হবে। তৃতীয় সিঁড়িতে তারচেয়ে বেশী হবে। ২৫ হাজার সিঁড়িতে যে কত বেশী হবে, সেটা ভাষায় ব্যক্ত করা চলবে না। সেই ২৫ হাজার সিঁড়ি নামতে নামতে, নামতে নামতে ১ সিঁড়ি। আমি এই ১ সিঁড়ির কথা বলছি না। এই ১ সিঁড়িতেই কত বড় বড় কবি, সাহিত্যিক হয়ে গেল। আবার কেউ বৃষ্টি আনে, আগুন জ্বালায়। আবার কেউ বা বৃষ্টি থামায়। সব ১ সিঁড়ির ক্ষমতা। আর ২৫ হাজার সিঁড়ির যে বার্তা, সেতো মহাকাশের বার্তা; মহাকাশের স্বরগ্রাম, মহাকাশের সা রে গা মা। সেই স্বরগ্রাম, সেই সা রে গা মা, এই দেহযন্ত্রে বাজাতে হবে। এটাকে ছেড়ে দিলে চলবে না। সহজে

ছেড়ে দিলে চলবে না। এই স্বরগ্রাম বাজাতে হবে। এটাকে বাজাতে হবে শিরায় উপশিরায়, রক্তের কণিকায় কণিকায়। তাহলে শিরায় উপশিরায় যদি এই বাজনা বাজাতে হয়, তাহলে এইটাই হল ধারা। তখন তুমিই হবে রাধা। ধারাকে বারবার বললে রাধা হয়ে যায়। দেহের মাঝে আছে যে ধারা— মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারের ধারা, এই ধারা হতে হতেই ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ আকাশ, ঐটাই হল কৃষ্ণ। এই ধারা থেকেই ঐ ধারার সাথে এক যোগে যুক্ত হয়েই হল রাধা। রাধার কার সাথে আলিঙ্গন? ঐ যে কৃষ্ণ, ঐ যে আকাশ, ঐ যে মহাকাশ, ঐ কৃষ্ণের সাথে এই ধারা, এক যোগাযোগে যুক্ত হয়েই হল রাধা। না হলে কোন ঘরের বউকে বাইরে বের করে নিয়ে আসেননি কৃষ্ণ।

এই যে কৃষ্ণ, আমাদের মথুরা, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, তিনি একজন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর গুণাবলী, তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর উদারতা, তাঁর প্রসারতা দেবতার স্থানে স্থান পেয়েছে বলেই গর্গ মুনি কি করিলেন? ঐ কৃষ্ণ নামে তাঁকে অভিহিত করিলেন। ইনিই কৃষ্ণ। কারণ এঁর ভিতরে যে গুণাবলী পাচ্ছি, এঁকে কৃষ্ণ বললে কোন ভুল করা হবে না। তাই এই কৃষ্ণকে, এই মহানকে ঐ মহাকাশের মহত্ত্বের বর্ণনার সাথে যুক্ত করে, তাঁর নাম দেওয়া হল কৃষ্ণ। আর রাধা সেইভাবেই হলেন রাধা, যাঁর ভিতরে ধারাবাহিকভাবে চলছে প্রেমের ধারা, তিনিই হলেন রাধা। সেই রাধা কে? এই রাধা হল, ঐ মহাকাশ থেকে চলছে যে ধারা, যে ধারায় ঐ ধরার সৃষ্টি হল। ধরা হ'ল ধরিত্রী। এই ধরিত্রীই হল রাধা। এই পৃথিবী, এই গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য— সবই মহাকাশের ঐ ধারায় সৃষ্টি। তাই প্রত্যেকেই রাধা। তোমরা

প্রত্যেকেই রাধা। ধারার থেকে যারা সৃষ্টি হয়েছে, তারাই হলো রাধা। আর কৃষ্ণের সাথে আমরা একই যোগাযোগে যুক্ত। তাই মানচিত্রস্বরূপ ঐ যে রাধাকৃষ্ণ দেখতে পাচ্ছ, ঐ রাধাকৃষ্ণ বাড়ীর বৌটিকে নিয়ে এসে তোলেননি। ঐ কৃষ্ণকে মূর্তি করলেন, আর ঐ ধারাকে মূর্ত্তি করে, প্রকৃতি পুরুষের মিলনকে এইভাবে যুক্ত করে দেখালেন। রাধাকৃষ্ণের মূর্তি সমাজের চোখে বৃহৎ বর্ণনায় যাতে বর্ণিত হয়, তারই আখ্যা ব্যাখ্যা দিয়ে, সমাজকে ঊর্দ্ধগামী করার জন্য, ঐভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তার উল্টো অর্থ, বিপরীত অর্থ এখানে হয়ে গেল। এখানে দেখানো হল, ঘরের বৌটিকে টেনে নিয়ে আসলেন। কৃষ্ণের কলঙ্কের সীমা নাই। কিন্তু ঐভাবে বর্ণনা করেছেন কারা? সীমাবদ্ধ বুদ্ধিতে যারা কৃষ্ণকে চিন্তা করেছেন, তারাই এভাবে দেখিয়েছেন।

কৃষ্ণ হচ্ছেন অসীম, অনন্ত নীলাকাশ। যাঁর বর্ণ আছে, বর্ণনা নাই। সেই কৃষ্ণকে আমরা স্মরণ করি। মহাপ্রভু সেই কৃষ্ণকেই স্মরণ করে হরেকৃষ্ণ বলেছেন। সেই কৃষ্ণই (মহাকাশ) হরণ করে নিয়ে যান, স্মরণ করে নিয়ে যান। আমরা সেই কৃষ্ণকেই স্মরণ করি। তাই হল হরেকৃষ্ণ।

হরেরাম হল কেন? রামের বর্ণ আর আকাশের বর্ণ এক বর্ণনায় বর্ণিত বলেই হল রাম। রা হচ্ছে মুক্ত আকাশের মুক্তবাণী। ম হচ্ছে মহাকাশের মহাবাণী। রাম হচ্ছে সেই মহাকাশের, মহাবাণী মহা সুরের সাথে যাহা যুক্ত হয়ে রয়েছে। তাই মহা সুরের সাথে যুক্ত আছে বলেই হল হরেকৃষ্ণ হরেরাম। এই **মহাকাশকে বর্ণনা করে বিভিন্নভাবে বিভিন্নসুরে একটা সা রে গা মা রচনা করলেন। কারা করলেন? ২৫ হাজার সিঁড়ির**

ওপরে বসে আছেন যে সব মহান, তাঁরা অনন্ত মহাকাশের সুরের ধারা ধরে ধরে এই স্বরগ্রাম রচনা করলেন। তাঁদেরই অনুগত ভক্ত, তার ভক্ত, তার ভক্ত এইভাবে ভক্তের ক্রম অনুসারে ২৫ হাজার সিঁড়ি থেকে নামতে নামতে এক সিঁড়িতে এসে যারা পৌঁছলেন, তারাই লিখলেন ১ সিঁড়ির কথা। আর ২৫ হাজার সিঁড়ির ওপরে অনন্ত মহাকাশে মহাসৃষ্টির ধারায় যাঁরা যুক্ত, সেই যুক্তধারার সাথে যুক্ত হয়ে, মহাকাশ থেকে রস টেনে নিয়ে, যে সুর তাঁরা নিয়ে আসলেন, সেই সুরেই প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাই **মহাকাশের সুরে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তার থেকেই বহির্গত হয়েছে, সেই মহানাম মহা সুর। সেটাই বেদবাণী। সেই বেদবাণীর যে বাণী, তার যে তত্ত্ব, তার যে মহত্ত্ব, তার যে গুণাবলী, তার যে ধ্বনি, তার যে নাদ, সেই নাদধ্বনির সুর আজ্ঞাচক্রে, বিশুদ্ধতে, অনাহতে, মণিপুরে, স্বাধিষ্ঠানে, মূলাধারে এবং সহস্রারে বিভিন্নভাবে বিভিন্নধারায় একেকজন একেকভাবে দেহবীণাযন্ত্রে বাজিয়েছিলেন।**

শ্রীকৃষ্ণ বাজিয়েছিলেন বংশের বাঁশী। তিনি কেমন করে বাঁশী বাজিয়েছিলেন? এই শল্‌ফা বাঁশের বাঁশী বাজাননি। এই যে কৃষ্ণ এমনি করে বাঁশী ধরে আছেন, আর তোমরা নৃত্য করছো, এই নৃত্য করতে আসেন নাই তিনি। এই বাঁশের বাঁশীতে কি সুর আছে? বংশের বাঁশীতে? এই বংশ খাউরা বাঁশের বংশ না। এই বংশ কোটি কোটি চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, অগণিত গ্রহনক্ষত্রের বংশ। এই যে বংশ, সেই বংশের ধ্বনি সপ্তসুরে বাজিয়ে বাজিয়ে, মূলাধার থেকে সেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করেছিলেন। কোন্ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি? যেই সর্প গহ্বরে থাকে, ৬ মাস খায়, ৬ মাস খায় না। এক দিন খায়, সাত দিন খায় না। সেই সর্প

নিজের গহ্বরের মধ্যে বিরাজ করে আর বাঁশের বাঁশী বাজালে এরা জাগরিত হয়। কিন্তু কুলকুণ্ডলিনীর যে সর্প, এমনি বাঁশের (বৃক্ষের) বাঁশীতে জাগে না। সেই বাঁশের বাঁশী আবার কোন্ বাঁশের বাঁশী? সেই বাঁশের বাঁশী হচ্ছে, সেই মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচক্রের অনন্তধ্বনি, নাদধ্বনি এবং সহস্রারের ধ্বনি। এই ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত করে, যেই যুক্ত সুর রয়েছে, এই দেহবীণাযন্ত্রে যদি সেই বাদ্য বাজানো যায়, সেই মূলাধারের সর্প আপনি আপনি উঠে উঠে স্বাধিষ্ঠানে আসে।

স্বাধিষ্ঠান হচ্ছে মূত্রদ্বার। এই মূত্রদ্বারে একফোঁটা সাগরের জল, এমনি করে ছিটিয়ে দিয়েছে এখানে। প্রকৃতি বলছে, 'আমি একটু নমুনা দিলাম। জীবজগতে কি করে, কি উথালপাথাল হয়, এখন দেখি।' দেখে কি, **এক ফোঁটা জলের আনন্দের স্বাদে সব বেটায় ছুটছে কামের নেশায়। কামের নেশায় চলছে সব। এই প্রেম, ভালবাসা, বিয়া, শাদি ইত্যাদি ইত্যাদি কামনায়, বাসনায়, আকাঙ্খায়, ক্ষণিকের তৃপ্তিতে, সব বেটা ছুটছে ঐ এক ফোঁটা জলের স্বাদে।** সাগর তো অনেক বড়। তারই নমুনা স্বাধিষ্ঠানে। সেই স্বাধিষ্ঠান ছেড়েই আর কেউ উঠতে পারছে না। কারণ এখানেই সব ভালবাসা। গুড়ের হাঁড়িতে পইরা পিঁপড়ায় মরে। কোনমত কইরা গুড়ের হাঁড়িতে মুখটা দেয়। তারপরে ঠ্যাংটা দেয়। ঐটা আঠায় লাগে। তারপর সবটাই দেয়। তারপর খায়। খাইয়া শেষে চিত হইয়া থাকে। ঐ গুড়ের হারাতেই মরে। গুড় খাইয়া আর সামাল দিতে পারলো না। আজকে আমরা কি করেছি? গুড়ের হাঁড়িতে পরে রয়েছি। পইরা কি হইছে? চ্যাপ্টা হইয়া রইছি। না পারি উঠতে, না পারি নড়তে। চ্যাপ্টা হইয়া রইছি। আর কত মিষ্টি খাব রে? আর কত মিষ্টি খাব? উঠতে পারতেছি না তো। কারণ ১ ফোঁটা জলের ছিটার মধ্যে পইরা

কে কারে মাথায় বাড়ি দিব, প্রেমের চিঠি, ভালবাসার চিঠি, ঘর থেকে বের হওয়া, বাপেরে ফাঁকি দিয়া বেরিয়ে যাওয়া, মায়রে (মাকে) ফাঁকি দিয়া বেরিয়ে যাওয়া, 'আমি চলে গেলাম, আমার জন্য চিন্তা করবে না,' কত কথা। কিসের ব্যাপারে এত কথা? একটা হিজরার লগে কেউ গেছে? একটা হিজরারে ভালবাইসা গেছে কেউ? 'ওই হিজরা, তরে ভালবাসি। তুই আয়', একথা বলছে কেউ? কেউ বলে নাই। কেউ যায় নাই। **ঐ কামের নেশা। এই কামনায় বাসনায় এমন ফেঁসে গেছে সব, এই ফাঁসের থেকে উঠতে আর পারছে না। তাতেই বলছে, এক ফোঁটা জল, সে তো সাগরেরই জল।**

কুয়া থেকে, টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে করে, পাড়া প্রতিবেশী সবাই তো কলসীতে কলসীতে জল নিয়ে যাচ্ছে। মুখ তো এতটুকু। জল তো ফুরাচ্ছে না রে বাবা। ঐ বেটা যুক্ত আছে সাগরের সাথে। তাই **এক ফোঁটা জলের আনন্দে আজ জীবজগতে পাগলা হয়ে সবাই ঘুরছে। কারণ সৃষ্টি, কাম উন্মাদনা। সৃষ্টিতত্ত্বের এমনই মাহাত্ম্য যে, তুমি একটা বেটা, বিয়া করতে গেলা, একটা মাইয়ারে (মেয়েকে) তোমারে সম্প্রদান করলো, ফুলের মালা দিল, আরও কত নিয়মকানুন করলো, বিয়া হইয়া গেল। ১ বছর পরে, 'আয়, আয়, আয়।** সোনা আয়। আয়, আয়, আয়।' বাচ্চা কুলে (কোলে) লইয়া ঘুরতাছ। আছিলা একটা মানুষ। হইল আরেকটা মানুষ। একটা মানুষের থিকা আরেকটা মানুষ বাইরাইয়া গেছে। **সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যে বিশ্বতত্ত্বের গভীরে একটা মানুষের কতবড় ক্ষমতা যে, একটা মানুষ হাজার হাজার মানুষ তৈরী করতে পারে।** একটা মানুষ হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ তৈরী করতে পারে। যার এতবড় ক্ষমতা, সে কী না করতে পারে? এই ক্ষমতা স্রষ্টার

আছে। স্রষ্টার যে বীজ তোমাদের মধ্যে ন্যস্ত আছে, এ কথাটা ভুললে তো চলবে না। মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে দেখবে যে, একটা মানুষের সারা জীবনের বীর্যকীটগুলো রেখে দিলে, একটা গোটা পৃথিবীতে জায়গা দেওয়া যাবে না। কয়েক হাজার পৃথিবী লাগবে, একটা মানুষের বীর্যকীটগুলোকে যদি মানুষ করা যায়। চিন্তা করে দেখ, একেকজনে কত কত মানুষ নিয়ে ঘুরছো। একেক জনে কতবড় ক্ষমতা ধারণ করে রয়েছ। যে মানুষগুলো বেরিয়ে গেছে (তোমাদের মতো), drainage হয়ে গেছে, নর্দমায় চলে গেছে, তাদেরে রাখতে কয়েক হাজার পৃথিবী লাগতো। এই গুলিকে যদি সঞ্চয় করে, একত্রিত করে রেখে দাও, কোটি কোটি লোক হবে, এক পৃথিবীতে ঠাঁই দিতে পারবে না বাবা। তাহলে বুঝতে পারছো, একজন মানুষের ভিতরে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের শক্তি। সেই শক্তি নিয়ে তোমরা চলছো। কিন্তু ঐ শক্তি রক্ষা করতে ভাল লাগে না তোমাদের। কোনমতে ফেলাইয়া দিয়া রেহাই পাওয়াই তোমাদের একমাত্র কাজ। ফেলাও তাড়াতাড়ি, এমনে তেমনে, এমনে সেমনে ফালাইয়া দিলেই হইল কাজ। কিন্তু ভিতরে যদি সেই সুর জাগাও, তোমাদের ভিতরে আছে কোটি কোটি মানুষ, যারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক নিয়ে বসে আছে। তারা তোমাদের সাথে সাথে মৃদঙ্গের সুরে সুর দেবে। গানের সাধনায় থেকে লক্ষ লোক গান গায় না? তারাও তোমার সাথে নাদধ্বনির গান গাইবে। **ঐ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টির ধারা অনুযায়ী কীটানুকীট হয়ে রয়েছে। তোমার তত্ত্বে, তোমার ধ্বনিতে সেই ধ্বনি ধ্বনিত হবে, যেই ধ্বনিতে পুরুষকায় হয়ে, দুইবাহু তুলে তারাও তোমার সুরে সুর দিয়ে, তোমার সাথে সাড়া দেবে।** তোমার বল (শক্তি) কতবড়। কত বলে তুমি বলীয়ান হয়ে

যাবে। এতগুলো বল (শক্তি) তোমার মধ্যে রয়েছে। আর সেই বলগুলিকে তুমি কি করছো? ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সবগুলিরে drain-এ ফেলে দিয়ে যাচ্ছ। বেদ তোমাদের নিরাশ করে নাই। বেদ বলছে, 'যা ফেলছো, যা গেছে, যাক। তবু যন্ত্রটা ধর। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার শেষ নিঃশ্বাস না পড়ে, দেহবীণাযন্ত্রটা বাজাও।'

তাই এবার যন্ত্রটা ধর। আপনমনে আপন সুরে যন্ত্রটা বাজাও। **শুধু হাটবাজার, রেশন আর অফিস-কাছারী করার জন্য এই সৃষ্টি নয়। বৃহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, বৃহৎ চিন্তা নিয়ে এই সৃষ্টি, এই জগৎ। সেই বৃহৎ উদ্দেশ্যের সাথে যতদিন পর্যন্ত না তুমি যুক্ত হবে, ততদিন পর্যন্ত এই ঘূর্ণীপাকের ঘূর্ণীতে, এই চক্রে বারবার করে তোমাকে ঘুরতে হবে।** কিন্তু যখন এই যন্ত্রটাকে (দেহবীণাযন্ত্রকে) তুমি বাজাবে; বাজাতে বাজাতে যখন তোমার মাঝে স্পন্দন হবে, rythm হবে, কম্পিত হবে, ঝঙ্কার হবে, নাদধ্বনির সাথে ধ্বনি দেবে, তখন দেখবে, তোমার সুর থেকে সেই সুর বেজে উঠছে। কোথা থেকে এক অজানা সুর এসে তোমার মাঝে ধরা দিচ্ছে। কোথা থেকে এক মহানন্দের ঢেউ তোমার মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করছে। আপনাআপনি এসে পড়ছে। কি করে হয়? কেমন করে হয়? তুমি বুঝতে পারছো না। আবার একেবারে বোঝা যে যাচ্ছে না, তাও তো নয়। সচেতনওয়ালার সচেতনতার সুরে সুরে সবকিছুই হয়ে যাচ্ছে আপনগতিতে আপনধারায়। কেমন করে হয়? যেমন করে বীজ থেকে গাছ হয়। তা কি তুমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছো? তুমি কি বল, 'ওই বীজ, তুই কোথায় ছিলি?' এতবড় বটগাছটা কি করে হল? বীজ তো অতটুকুনু। কি করে হল? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যেমন কেউ দেখে না, এই মহাধ্বনির মহাবীজ এই দেহক্ষেত্রে পুঁতে

দিলে এমনি করে বেজে ওঠে, জেগে ওঠে। **ঐ মহাধ্বনির সুরকে তখন ধরে নিয়ে তোমার এই টেপরেকর্ডের (দেহক্ষেত্রের) মধ্যে দিয়ে দিলে, ঐ বার্তাগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং টেপরেকর্ডের সেই বার্তার যে ধ্বনি, আপনিই তোমার কর্ণে, তোমার ত্বকে, সারা দেহে সবার মধ্যে সেটা জেগে ওঠে। ঐ ধ্বনিই তখন তোমাকে নির্দেশ দেবে, তুমি কেন এসেছ? কোথায় তুমি যাবে এবং তোমার কি করণীয়?**

তারজন্য তোমাদের বলছি, সবকিছু তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে চলার তোমাদের প্রয়োজনীয়তা নাই। কবিরাজের বটিকা ঐটুকুনুই যথেষ্ট। যদি গাছ-গাছড়া কেটে নিয়ে বটিকা বানিয়ে, তারপর রোগীকে খাওয়াতে হয়, তবে আর রোগীকে খাড়া করতে পারবে না। একেকটা বড়ির মধ্যে ৫০টা গাছের ছাল-বাক্‌লা থাকে। ঐ ৫০টা গাছের ছাল-বাক্‌লা খুঁজতে গিয়া রোগী এদিকে চিৎ হইয়া পড়বে। তাই বটিকাটাই নাও। **স্বরগ্রাম হিসাবে, মন্ত্র হিসাবে, ঐ সমস্ত বেদের সারকথা সারমর্মরূপে মহাকাশ থেকে নেমে এল সেই ধ্বনি। বেদমাতা গায়ত্রী।** প্রকৃতি হচ্ছেন গায়ত্রী। প্রকৃতি হচ্ছেন স্রষ্টা এবং মহাকাশ থেকে সেই ধ্বনি নেমে আসলো। নেমে এসে কি হল? রা আসলো, ম আসলো 'রাম নারায়ণ রাম'। এখানকার রাম নারায়ণ রাম নয়। ঐ রাম নারায়ণ রাম হচ্ছে মুক্তাকাশের মুক্তবাণী। মহাকাশের নিঙড়ানো রস ঐ ধ্বনি। মহাকাশের মহাতত্ত্বের অনুপরমাণুর অণু ধ্বনি ধ্বনিত হয়ে, অনুপ্রাণিত হয়ে, অণুর দিকে গতি হয়ে, গতিশীলের গতির দিকে গতি অনুযায়ী অনুপ্রাণিত হয়ে, সেই সুরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, সেই সুরগামী হয়ে, সেইগতির পথে গতি হয়ে অগ্রসর হতে হতে, আরও আরও আরও জানার পথে এগিয়ে চলেছে সেই সুরধ্বনির ধ্বনি। এটা

বিজ্ঞানের কথা। কোনরকম কোন ভাবের কথা নয়, কল্পনার কথা নয়।

সেই সুরধ্বনির ধ্বনি, অণুপরমাণুর সারকথা, সারমর্ম মহাকাশের চেতনার চৈতন্যে কুয়াশার যে fog (ফগ), জলবিন্দুর মত নিয়ে এল সেই ২৫ হাজার সিঁড়ির স্বরগ্রাম, রাম নারায়ণ রাম। সেটাকে কি করতে হবে? সেটাকে এই যন্ত্রে (দেহযন্ত্রে) বাজাতে বলেছে। সেটা কি করে বাজাব? সমস্ত সন্তানেরা (সন্তানগণ তখন ছিল) শিবের কাছে গেলেন। বিষ্ণুর কাছে গেলেন। বেদজ্ঞদের কাছে গেলেন। 'প্রভু, আমাদের কি করণীয়? আমাদের কি করা উচিত?' তখন বললেন, 'আর কিছু নয়। আজ্ঞাচক্রে, মূলাধারে, মণিপুরে, অনাহতে সহস্রারে বিশুদ্ধে তোমরা এই সুর দিয়ে যাও।'

—কি করে দেব?

—তোমাদের আলাদা আলাদা করে সুর দেবার প্রয়োজনীয়তা নাই। তোমরা এক কাজ কর।

—কি?

—এই মূলাধার থেকে সহস্রারে একটা সুর দিয়ে যাই। সেই সুর অনুযায়ী তোমরা সুর দেবে।

তখন বেদজ্ঞরা এই ধ্বনি নিয়ে বসে আছেন। বিষ্ণু নিজে বলছেন, শব্দগুলো জানলেও, ভিতরে গেলেও উপকার হবে। শিব নিজে বলছেন, এই ধ্বনির ধ্বনিতে মুক্ত হয়ে যাবে।

কারণ এই বেদধ্বনি হচ্ছে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের কাছে কারও কিছু বলার নেই। এটা মহাবিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান থেকে স্পুটনিক হয়েছে। বেদের বিজ্ঞান থেকে চন্দ্রলোকে গিয়েছে। সোনার রথে ধ্রুবলোকে গিয়েছিল মেঘের আড়ালে।

ধ্বনি হচ্ছে নাদ। নাদই হচ্ছে ব্রহ্ম। বেদের ধ্বনি ও নাদ, এই শব্দধ্বনির উপর সব নির্ভর করছে। সাধকরা সেই সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করে থাকেন। শুধু সাধকরা কেন, শুধু সাধু সন্ন্যাসীরাই সাধক নন। জীবজগতে সবাই সাধক, সবাই যোগী। সুতরাং সবাই সেই সাধনায় আছে। ধ্বনির সাধনা, নাদের সাধনা, শব্দের সাধনা সবাই করে থাকেন। তাই আজ যারা লেখাপড়া করছেন, লেখাপড়া না করে যারা ভাষা শিখেছেন, সেই ভাষাই হচ্ছে শব্দ। শব্দই হচ্ছে ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মকে জানার জন্য, এই শব্দের আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। মনের কথা ব্যক্ত করার জন্য, এই শব্দের প্রয়োজনীয়তা আছে আর জীবজগতে সমস্ত জীব, মানুষ সবাই শব্দকে কেন্দ্র করে চলছে। ভাষাকে কেন্দ্র করে সবাই অগ্রসর হচ্ছে। শিক্ষায় দীক্ষায় বড় হচ্ছে। কবি, সাহিত্যিক সব এখানে গড়ে উঠছে। সুর সাধনায় সুরজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছে। আজ জীবজগতে মহাকাশে এই মহাধ্বনি অবিরাম অবিরত বয়ে চলেছে। সেই ধ্বনি হতেই জগতের সৃষ্টি। সেই শব্দকে যে নিজের সুরে আয়ত্তে আনতে পারে, তিনি হলেন স্রষ্টার সাথে যুক্ত। সেই যোগাযোগকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনেকে যোগ অভ্যাস করে থাকেন। যোগ অভ্যাস করতে গেলে হাত-পা চিৎ করা বা নানারকম আসনের ভঙ্গিমা করার কোন প্রয়োজনীয়তা হয় না। সর্ব অবস্থায় সর্ব সময়ে মানুষ এবং জীবজগতের সবাই যোগ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই যোগ করে চলছে। তাই বলা যায়, সবাই সাধক, সবাই যোগী।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আবার কবে দেখা হবে জানিনা। তোমরা আমার অন্তরঢালা প্রেম ভালবাসা নিও।

লেকটাউন, কলিকাতা
২৩শে আগষ্ট, ১৯৯২

শ্রীশ্রীঠাকুর কী চান—

আমি আমার দেশের (ভারতবর্ষ, পৃথিবীর) সন্তানদের নিয়ে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সন্তান নিয়ে সেই আজ্ঞাচক্রে মন রেখে, সহস্রারে মন রেখে সবাইকে সেই সুরের সাথী করতে চাই। আমি জেগে সবাইকে জাগিয়ে দিতে চাই। এ দেশের সন্তান, আমার ঘরের সন্তান, তোমরা আমার পথের পথিক হও, যাত্রিক হও। তোমরা সেই সুরের সাধনায় আত্মোৎসর্গ কর। সবাই যাতে সেই অন্তর্নিহিত সুরকে জাগিয়ে তুলতে পারে, তারজন্য সচেষ্ট হও। তোমরা সেই সুরের সাথী হও, সেটাই আমি চাই। তাই সবাইকে বলে যেতে চাই, মহাকাশের মহানাম মহা স্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম।

রাম নারায়ণ রামের অর্থ — (বেদ মন্ত্রের মাধ্যমে)

বেদ মন্ত্র...। আমি কি বলছি?

সংসারে সমাজে জঞ্জাল পরিষ্কার করো। শোষক গোষ্ঠীকে বিতাড়িত করো। সঞ্চয়কারীকে প্রশ্রয় দেবে না। ধনী-গরীবের মধ্যে বৈষম্য রাখবে না। সমাজের ভিতরে সবাইকে একজাতিতে

পরিণত করো। সমাজে থাকবে একটাই নীতি, একনীতি। কর্মীরা কর্ম করবে। সব কর্মীর একমূল্য দেবে। কাউকে উঁচু নীচুতে বা ব্যবধানে রাখবে না। তাই সবাই এক সুরে এক ধ্যানে এক জ্ঞানে এক প্রেমে একান্নভুক্ত পরিবারের মতো চলবে।

'রাম নারায়ণ রাম'-এর এই অর্থ বলে যাচ্ছি— এই সমাজের বুকে যারা নীতিভ্রষ্ট, যারা শয়তান, যারা শোষক, যারা অসুর, তাদের সমাজ থেকে অপসারিত করে সবাই একত্রিত হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে থাকবে। বেদমন্ত্র...। যদি পবিত্র হতে চাও, মুক্তি পেতে চাও, মুক্ত হতে চাও, ঝাড়ু হাতে সমাজের জঞ্জাল দূর করে ফেল। যত জঞ্জাল, চারিদিকের জঞ্জাল দূর করবে, তোমার মনের প্রসারতা তত বাড়বে। নিজে পবিত্র হওয়ার পক্ষে অতি সহজ হবে। তাই এই মহামন্ত্রের মহা সুর, মহাকাশের মহানাম এই রাম নারায়ণ রাম।

এই নামে আছে সেই মহান অর্থ— বিজ্ঞানের অর্থ, যুক্তির অর্থ, সমাজ কল্যাণের অর্থ। এতে আছে সেই Mathematics, গণিত। তোমরা সেই সাধনায়, এই ধমনীর ধারায় ধারায়, শিরায় উপশিরায় জাগিয়ে তোল এই মহাকাশের মহানাম মহা স্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। বেদমন্ত্র...।

এই পবিত্র নাম 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম'... গেয়েছিলেন শ্রীগৌরহরি। তাঁরই শেষ রক্তে এই অভাগা তোমাদের কাছে বারবার বলছে, একই কথা। তোমরা এই অভাগার কথা শোন শোন। আমি এখানে 'ঠাকুর', 'ভগবান' বনতে আসিনি। আমি সাধারণ মাটির কর্মী হয়ে, তোমাদের সাথের সাথী হয়ে, সবাইকে সেই সুরের সাধনায় নিয়ে যেতে এসেছি। আমি ৫ বছর বয়স থেকে দীক্ষা দিচ্ছি, ৭ বছরে দীক্ষা দিচ্ছি। জন্ম থেকে

যে সুর নিয়ে এসেছি, সেই সুরের সাধনায়, সেই সুরের মাধ্যমে তোমাদের সাথের সাথী হয়ে, চলতে চাই মহানামে। যেই নামের মাধ্যমে সব সুর জানা যায়, সেই সুর রাম নারায়ণ রাম।

এই মহানামের মহান অর্থ— অনেক অর্থ আছে। ঝড়-ঝাপ্‌টা, আঘাত-প্রতিঘাত আছে; অপপ্রচার, দুর্নাম আছে। আর আছে ঝড়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও লড়াই; যাহা জীবনের উপরে ঘটে গেছে— কত আঘাত, কত অত্যাচার, কত জঞ্জাল। শ্রীগৌরহরি তার থেকে বাদ যাননি। এমনি কত আঘাতে আঘাতে তাঁর অকালে মৃত্যু। এই তাঁর শেষ রক্ত। হয়নি কোন ব্যতিক্রম। তাই তোমাদের কাছে বলি, তাঁর হয়ে কথা। তোমরা আমার এই সংস্কারের কাজে সহযোগিতা করো। আমি যেই ধ্যান, জ্ঞান নিয়ে, পাঠ নিয়ে, সমাজের বুকে যেই বৈপ্লবিক ধারায়, বৈপ্লবিক চিন্তায় এগিয়ে চলছি সবাইকে নিয়ে, তোমরা তার সাথের সাথী হয়ে বল, রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম। বল জগতের কাছে এই নাম, রাম নারায়ণ রাম।

তোমাদের কাছে এই কথা বলি। **আবার কবে দেখা হবে, জানি না। তোমরা আমার অন্তরঢালা প্রেম ভালবাসা নিও। তোমরা ভুলে যেও না, এই বাচ্চা শিশুর কথা।** আমার নাম 'বালক ঠাকুর', 'বালক ব্রহ্মচারী' নয়। শিশু বয়স থেকে সবাই দিয়েছে বলে আমার এই নাম। শিশুবয়সেই বলতো সবাই, 'বালক ঠাকুর', 'বাচ্চা ঠাকুর', 'বালক গোঁসাই', 'বালক ব্রহ্মচারী'। তাই হয়েছে এই নাম। নাহলে 'বালক ব্রহ্মচারী' কোন আশ্রমের দেওয়া নাম নয় এবং আমি কোন মঠে মন্দিরে মোহন্ত সেজেও বসিনি। আমি তোমাদের কাছে ঠাকুর বনতে চাইনি; ভগবান বনতে আসিনি। আমি যেই সুর সাধনায়, যে

সুর নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, সেই সুর তোমাদের কাছে ঢেলে দিচ্ছি। তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে এক সুরে, এক আত্মায় থেকে শুধু বল, রাম নারায়ণ রাম। বছরে বছরে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে তোমরা সবাই এক সুরে থেকে, তাঁর ধ্যান জ্ঞান, প্রেমের সুরের মাধ্যমে শুধু বলবে, রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম।

শুধু এই কথা বলে শেষ করছি যে, ৫ বছর ৬ মাস বয়স থেকে দীক্ষা দিচ্ছি। গ্রামের শিক্ষক, স্কুলের মাষ্টার, পাড়া-প্রতিবেশী, গুরুজনস্থানীয় আত্মীয় স্বজন ও হাজার হাজার গ্রামবাসী ছুটে এসেছে এই বাচ্চার কাছে। কেন এসেছে? কিসের জন্য এসেছে? সেই কথা আমার মুখে বলতে চাই না। শুধু তোমাদের কাছে খুলে বললাম একটা বাচ্চা শিশুর কথা। তোমরা মনে রেখো। তোমরা বিভ্রান্ত হয়ো না, ভুল করো না। ভুল বুঝ না। বহু ঝড়-ঝাপ্‌টার ভিতর দিয়ে আমাকে চলতে হয়। **শুধু একটি কথা মনে রেখো। আমি কি করি, তোমরা দেখো না। আমি কি বলি, তোমরা জেনে নিও। এই কথাটা মনে রেখো। কাজেই মহাকাশের মহানাম সবাই মিলে বলো, হরেকৃষ্ণ হরেরাম, রাম নারায়ণ রাম।** বলো, রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সাপ ধরার মন্ত্র কি? যত অশ্রাব্য কুশ্রাব্য গালিগালাজ

পাম এ্যাভিনিউ, কলকাতা
২৮শে আগষ্ট, ১৯৬৬

এই জগতে যা আমরা দেখতে পারছি, যা আমরা অনুভব করতে পারছি, এগুলো যে আমাদেরই রূপ; রূপে রূপেই যে রূপ তৈরী হয়ে যাচ্ছে, এটা আগে বুঝতে হবে। **যে যে বিষয়বস্তু দ্বারা যে যে রূপ তৈরী হয়, এই রূপে থাকাকালীন সেইরূপেই যে মিশে থাকতে পারে। যে রূপে তৈরী হয়েছে, সেই রূপেই যে মিশে থাকতে পারা যায়, রূপগুলোই তার প্রমাণ।** মিশে থাকার কালে একদিন আমরা যখন মিশে ছিলাম বা দৃষ্টির অগোচরে ছিলাম, সেই অবস্থা থেকে যখন এই রূপ নিলাম, এ থেকে এইটুকু বুঝলাম যে, আমরা সেই অবস্থায় ছিলাম এবং আমরা যখন খুশী সেই রূপে বিরাজ করতে পারবো। সেই অবস্থায় যখন ছিলাম, তখন অনায়াসে সেই রূপে যেতে পারবো। প্রকৃতি বুঝিয়ে দিচ্ছে, যেই রূপ সহজে বিরাজ করছে, **তোমরা ইচ্ছা করলে তোমাদের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সেই রূপে অনায়াসে মিশতে পার, যদি তোমাদের সেই প্রচেষ্টা থাকে। কিন্তু তোমাদের চেষ্টা থাকুক বা নাই থাকুক, যদি ইচ্ছা, নাও থাকে, আমি তোমাদের মিশিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। যেই নিয়মাবলী দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, সেই নিয়মাবলী দ্বারা যদি আমরা অগ্রসর হবার চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয়ই মিশবো।**

প্রকৃতির সুরে যেভাবে আলো বাতাস টেনে নিয়ে জীবনধারণ করতে চেষ্টা করছি, আমাদের চেষ্টার ধারা সেদিকে নয়। আমাদের

চেষ্টার ধারা অন্যদিকে, পরিবর্ত্তনের পথের দিকে, মৃত্যুর পথে। এই পথ, যেটা সহজে হয়ে যাচ্ছে, আপনি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, এই পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। পুনরায় যাতে প্রকৃতির পথ নেয়, সৃষ্টির পথ নেয়, সেইজন্য আবার পরিবর্ত্তনের রূপ নিয়ে মৃত্যুর খেলাতে এনে, অন্যভাবে এনে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। এক সাধক বাতাসে উঠতে চেষ্টা করছে। একমাত্র কোন্ পথ অবলম্বন করলে জলের সঙ্গে মিশে থাকা যায়, আকাশে বাতাসে ক্ষুদ্র হয়ে মিশে যাওয়া যায়, প্রকৃতির সুরে সুর মিশিয়ে, জানার পথে জানতে জানতে, জেনে নিতে হবে। আগে এই উপরে উঠার নিয়ম অতি সহজ নিয়ম ছিল। আমরাই তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে, অতি কঠিন করে নিয়েছি। পৃথিবী খালি জায়গায় শূন্যে ভাসছে। এই **খালি জায়গা হতে যখন আমরা সৃষ্টি হয়েছি, আমরা শূন্যে উঠতে পারবো না কেন? পৃথিবী শূন্যে ঝুলছে। ফাঁকা জায়গা হ'তে যে বস্তু সৃষ্টি হয়, ইচ্ছা করলে সেই বস্তু শূন্যে ভেসে থাকতে পারে।**

এই দেহ সমূহ শূন্যে লম্ফ দিয়ে উঠতে না পারলেও, মনটা সবসময় ফাঁকা জায়গায় ঘুরছে। দেখা কাজটা ফাঁকা জায়গা হতে আসে। শোনা কাজটা ফাঁকা জায়গা হতে আসে। কাজেই দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি শূন্যে আছে। নাক দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে আমরা যে বেঁচে আছি, এই শ্বাস-প্রশ্বাস ফাঁকা জায়গা হতে হয়ে চলেছে। তবুও তুমি নিজে উড়তে পারছো না। তুমি নিজে উঠতে না পারলেও, প্রকারান্তরে ইন্দ্রিয়গুলি শূন্যে উঠার কাজ করে চলেছে। ইন্দ্রিয়ের শক্তি প্রকারান্তরে তোমারই উঠার শক্তি। একটা লোককে টেনে উঠানো যায়। ঝাঁকি দিয়েও উঠানো যায়। জল তুমি দূর থেকে উঠাচ্ছ। এদিক দিয়ে টানছে, ওদিক দিয়ে টানছে। তোমার যে সব দিক দিয়ে উঠছে। এই যে বড় বড় বস্তা দড়ি দিয়ে টেনে নেয়, আমাদেরও টেনে নেয় সেইরূপ। তোমাদের টানবে কে? চোখে

দেখছো, দূরে আকাশে এতটুকু তারা। এক একটা তারা এই পৃথিবীর থেকেও বড় আছে। জলটা যখন শূন্যে বরফ হয়, জলটা যখন টেনে নেয়, তোমরা বুঝতে পার না। নিয়ে যাওয়ার সময় বুঝতে পারছো না। সূর্যের তাপ টেনে নিচ্ছে। ধর, জলটা আমাদের দেহ। জল নানা আকর্ষণে উপরে উঠছে। বাতাস টানছে, সূর্য টানছে, হু হু করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দেখতে পারছো না। জল যখন উপর থেকে পড়ে, শহর ডুবে যায়। দেশময় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আসাম, জলপাইগুড়ি ভেসে গেছে। জল ধাক্কা দিয়ে উপরে উঠলে, তোমরা কেহ থাকতে পারতে না। জল বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়। আরও কতগুলো আকর্ষণের জিনিস আছে, তার সঙ্গে মিশে যায়। ক্ষণে জল, ক্ষণে বাতাস; আকাশময় জল। নদীকে নদী টেনে নিয়ে যায়। আমরাও সেইরূপ সূর্যের টানে টানে মিশে যাচ্ছি। মানুষ ও যত জীব আছে, প্রত্যেকের মাঝেই সূর্যের অংশ আছে। সবটার কিছু কিছু অংশ আছে।

দর্শনশক্তি টানছে, শ্রবণশক্তি টানছে আর টানছে ধ্বনিতে। এই যে আমাকে টেনে নিচ্ছে, বুঝতে পারছি না যদিও, তবে একেবারে বুঝতে পারছি না, তা নয়। তোমরা কিছুটা বুঝতে পারবে। জল যে টেনে নেয়, ফাঁকাটা কি নেয়? **তোমরা যতদূরে তাকাচ্ছ, ততদূর রাস্তা তোমাদের সহজ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই মন্থনে দুধ হতে মাখন হয়ে যায় যেমন, তোমাদের এই টানার কাজটাও পাকা হয়ে যায়।** এতটুকু ফাঁকা জায়গার মধ্যে তোমার যে soul রয়েছে, সবটা সূর্য। চিন্তা কর, তুমি উঠছো মন্থনে, সম্মুখে একটা আলো আসবে। **বড় বড় ফ্যাক্টরীতে চুম্বকের মত আকর্ষণে শূন্যে একটা বিম চলে যাচ্ছে। সব টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কে টানছে, দেখতে পাওয়া যায় না। এই যে মনের মন্থন করবে, তাতে তুমি যে কাজ করছো, চুম্বকের মত হয়ে যাচ্ছে। চুম্বক হওয়া মাত্র আস্তে আস্তে**

করে, তোমাকে টেনে উপরে নিয়ে যাবে। কোথায় যাবে? এস্‌প্ল্যানেড—অমুক বাড়ীর ছাদে উঁকি দিচ্ছে। মেয়েটা কি করছে? বেশীরভাগই এই হয়।

উপরে ওঠার কারণ কি? উপরে উঠতে চায় কেন? যে কারণে সৃষ্টি হয়েছে, দেহ থাকাকালীন, বেঁচে থাকাকালীন যদি তাপে ঐ চুম্বকের সাথে মিশতে পারে, আলগা আলগা হয়ে যায়। আলগা হয়ে গেলেও একেবারে মিশে যায় না। তবে আকাশ, জল, তাপ এগুলোর সঙ্গে যেন মিশে যায়। প্রচণ্ড উত্তাপে লোহা গলিয়ে ফেলে। এই দেহটাও যেন জলের মতন গলে যায়। গলে যেয়ে মিশে যায়। মিশে গিয়ে কি হয়? দেহ থাকাকালীন মিশে গেলেও, বুঝ নষ্ট হয় না। বুঝটাও রবারের মত এত লম্বা হয়ে যায়। ধর, বুঝটা যদি সূর্য পর্যন্ত লম্বা হয়ে যায়, তাহলে তো কোন কথাই নাই। বুঝও সেভাবে চলবে। সাড়ে তিন হাতের বুঝের ঠেলায়ই অস্থির। বিদ্যুৎ যেমন হয়, আকাশে বিদ্যুতের মতন আলোর সাথে খেলতে থাকে। বিদ্যুতের মত বুঝগুলি আলোর সাথে খেলতে থাকে। এখান থেকে সূর্য পর্যন্ত বুঝটা অতবড় হয়ে যায়। এতটুকু জিনিস যে এতবড় হয়ে যায়, তাতো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এতটুকু বীজ কতবড় গাছ হয়ে যায়। চিন্তাটা এতবড় হয়ে যায়। বুঝ, জ্ঞান এতবড় হয়ে যায়। তুমি যখন ভাবলে আকাশের মতন বুদ্ধি, চিন্তা, বুঝ হয়ে গেল। গাছ বড় হয়ে ফুল, ফল বের হয়। বীজটা ছোট হয়ে বের হল। কি পড়লো, বটগাছ পড়লো। **এতবড় গাছ, বীজটা এতটুকু। তোমরাও সেইরূপ। এক একটা সাড়ে তিনহাত বীজ। তোমাদের বুদ্ধি এতটুকু বলে, ভুলে গেছ। কিন্তু বীজ পুঁতলে বড় হয়, এটাতো বুঝতে পারছো।**

মনের ব্যাপ্তি যে এতবড়, এত বিরাট ভাষায় ব্যক্ত করা যায়

না। মন্থনে আলোড়ন হয় কি? মনের মন্থনেও আলোড়ন হয়। **একজনকে ধর গালি দিলে, 'আপনি এত দুষ্ট, এত পাজি। আপনার মত শয়তান দুনিয়ায় নাই।' মন খারাপ হল। আবার 'আপনি অদ্ভুত দাতা, অদ্ভুত ভালো।' মন প্রসন্ন হলো। কথায় কথায় মন নাচছে। আবার একজন আসছে, 'আপনি কৃপণ, রাবিশ, নিন্দুক', মন ক্ষিপ্ত হলো। কাজেই কথার প্যাঁচে মন নাচতে আরম্ভ করেছে। শব্দে কি রকম টলমল করছে। কাজেই শব্দে যদি মানুষ এদিক ওদিক করে, কিছু করার নাই। তুমি কাউকে বললে, 'শুনলাম, আপনার বাবা মারা গেছেন'। শুনেই ধাঁ করে পড়ে গেল।** 'তুমি ফেল হয়েছ', শুনেই গলায় দড়ি দিল। এক একটা শব্দ, তার কি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া (Reaction). চিঠিতে রয়েছে, 'তোমার শ্বশুর প্রমোশন পেয়ে আরা (আরাকান) গেছে।' আর পড়ছে মারা গেছে। শুনে বাড়ীতে কান্নাকাটি। শেষে একজন লোক এসে বুঝিয়ে দিল, প্রমোশন পেয়ে আরা গেছে। তখন সবাই শান্ত হয়। চিন্তা করে দেখ, একটা ভুল শব্দে বাড়ীশুদ্ধ কিভাবে হৈ হুল্লোড় লাগতে পারে। কাজেই এই যে বাতাস, সূর্য এত হৈ হুল্লোড় কি করে লাগাতে পারে, তা দেখতে হবে।

আমার এক ভক্ত সাপের ওঝা। কড়ি পড়া ছেড়ে দিয়ে, সাপকে ধরে আনতে পারে। মন্ত্র কি? যত অশ্রাব্য কুশ্রাব্য গালিগালাজ।

আমি বলি, 'তোর মন্ত্রে যদি সাপ আসে, বল দেখি তোর মন্ত্র।'

সে সভ্য ভাষায় বলছে, 'আমার বাপ যদি তোর বাপ হয়', ইত্যাদি। এই অশ্রাব্য ভাষায় অকথ্য শব্দেতেই সাপ এসে উপস্থিত। শিষ্য ওঝা দেখছে, সাপ চৌকির কিনার দিয়ে ঘুরছে। কিন্তু চৌকিতে আর উঠে না। সে জিজ্ঞাসা করে, 'কিভাবে শুয়েছিলেন?' ওর চুল

ছেড়ে শোবার অভ্যাস ছিল। সেইভাবে শোয়ানো হল। সাপ ঐ চুল দিয়ে উঠলো। শৌখিন শোওয়ার কতরকম অভ্যাস আছে তো। কাজেই **গালিতে যদি সাপ আসে, এই সাপ তো চন্দ্র, সূর্য হতে আসে না। আকাশের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু আছে, ঐগুলো গালি দিলে আসবে না। কি করলে আসবে?**

তোমরা তো জান, কড়, কড়, কড়াৎ করে, ঠাস্ ঠাস্, গুরুম্ গুরুম্ না করলে চন্দ্র সূর্য আকাশ, বাতাস কথা শুনবে না। মানুষ তো এরকম খালি জায়গায় গিয়ে হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করতে পারে না। **চিনির বদলে স্যাকারিন বেরিয়েছে। এতগুলো টাকার বদলে ব্যাঙ্কের চেক হয়ে যেমন কত সুবিধা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা চেক কেটে, নিয়ে যেতে পারে। মেঘের মত শব্দ করতে হলে গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাবে। কাজেই চেকের মত, স্যাকারিনের মত এমন একটা শব্দ আনতে হবে, যাতে বাতাসে আলোড়ন, সূর্যে আলোড়ন সব আনা যায়।** ডিম সিদ্ধ করে খেলে বা ডিম ফাটালে, এগুলো প্যাক প্যাক করে না। আবার বেশী তাপ দিলে ফোটে না। রৌদ্রে রাখলেও ডিম ফোটে না। এমন একটা তাপে ফোটে, যা সবাই জানে না। আমাদের এখানে যেমন ৯৮° ডিগ্রির উপরে উঠলেই জ্বর; ঐ থার্মোমিটার নিয়ে ঐ হাঁসের কাছে গিয়ে যদি দেখ, ওর বাচ্চা ৯৭.২° ডিগ্রি তাপে রাখা হয়েছে, আর ফুটুস্ ফুটুস্ করে ফুটে উঠছে ডিম, তাহলে তাপের মাত্রাটা তুমি জানতে পারলে। এখন ঐ মেঘ হতে, সূর্য হতে, পৃথিবী হতে, শব্দ হতে এমন মাত্রায় ধ্বনি বা শব্দ খুঁজে পেলাম। ঐ শব্দটা মধ্যে মধ্যে চিন্তা করতে হবে। ধর, ঐ শব্দ ১১০° ডিগ্রিতে কাজ করে। ঐ ডিগ্রিতে কাজ করতে আরম্ভ করলাম। সূর্যের আলোতে যদি সব বাড়ীতে আগুন লাগতো, কি হতো বলো ত? চশমার কাঁচ দিয়ে, ভারি চশমার মধ্য দিয়ে, সূর্যের তাপ Concentrate করলে যেমন আগুন জ্বলে,

আমাদের মধ্যে সেরূপ তাপ আছে। **শরীরের মধ্যে ৯৬°/৯৭°/৯৮° ডিগ্রি তাপ আছে। পেটের মধ্যে ১০২°/১০৫° ডিগ্রি তাপ আছে। সূর্যের তাপে আতস কাঁচের মধ্য দিয়ে যেমন আগুন জ্বলে, আমাদের মধ্যে কেন সেই আগুন জ্বলে না? আমাদের মধ্যে কেন সেই আগুন জ্বলবে না?** আমাদের মধ্যে লেন্স আছে। সেই জায়গায় মন রেখে, যদি সেই শব্দ উচ্চারণ করি, একটা অদ্ভুত আলো সোঁ সোঁ করে উঠতে থাকবে। সেই আলো সমস্ত কিছুর সাথে সম্পর্ক করবে। একটা অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি করবে। **জীবিত অবস্থায় ধর, ½ সেকেণ্ডে দিল্লী চলে যাবে। কারণ যে আলো জ্বলবে, তার স্পীড এত বেশী যে, মনের লক্ষ গুণ স্পীডে সেই আলো জ্বলে। ঐ আলোটার এত গতি, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সূর্যের থেকে ঘুরে আসতে পারে।** এত শক্তি আমাদের মধ্যে আছে। আমরা যদি তার সদ্ব্যবহার না করি, তা হলে কি করে হবে?

একজন একটা হীরা পেয়েছিল। সে হীরাটা তার বাচ্চাকে দিয়েছে। হীরাটা বাচ্চার খেলার বস্তু হয়ে গেছে। আমাদেরও সেইরূপ, সেই শক্তি হীরার মতো একটা খেলার বস্তু হয়ে গেছে। এটা যে পরম মূল্যবান জিনিস, একে কাজে লাগাতে হবে। শরীরের এই যে গাঁটগুলো (গ্রন্থি) আছে, তাতে যদি মনন করি, মন যদি সেইভাবে রাখবার চেষ্টা করি, তাহলে ফুটে উঠবে। বেশীরভাগ কাজ করে স্বপ্নে। তোমাদেরও স্বপ্নে কাজ করতে হবে। স্বপ্নে সাধারণতঃ মানুষ কত কি করে। কত জায়গায় বেড়ায়, কতজনের সাথে কথা বলে, আরও কত কি করে। ঘুমালেই তা ফোটে। সূর্য ডুবলে যেমন অনেক ফুল ফোটে। তারা স্বপ্নের মাধ্যমে দেহটাকে এদিক ওদিক ঘুরায়। কোনকিছুর ঠিক নাই। কারণ লাইন মতো কাজ হয় না বলেই, মন এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে। লাইনমতো হলে রাস্তায় ঘাটে সুন্দর গতি লাগিয়ে চলতে পারতো। **স্বপ্নের ফাঁকা**

জায়গায় মনকে যে স্মরণ করছো, তাতে ঐ জপটা বাড়ি খায়। জাগ্রত অবস্থায় মনের যে কাজ হয়, তারচেয়ে হাজার গুণ বেশী কাজ হয় স্বপ্নে। কাজেই সাধকরা চিন্তা করেন, মনের কাজটা যাতে কোন প্রকারে স্বপ্নের সঙ্গে লাগানো যায়। 'স্বপ্নে যেন আসন করতে পারি,' এই প্রার্থনা করতে থাকে। কেউ কেউ স্বপ্নে শূন্যে উঠে গেল; কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। যেই জাগলো, ওটা আটকে যায়। জেগেও ওটা থেকে যায়। ওটা যাওয়ার আর সময় পায় না। ঘুমের মধ্যেই ঝাঁকি দিয়ে উপরে উঠে যায়। জাগ্রত অবস্থায় ঐ উপরে ওঠার শক্তিটা রয়ে গেল। স্বপ্নের যে আসন, এটা সুন্দর আসন। তোমরা যদি স্বপ্নে এটাকে যোগ করে নিতে পার, তাহলে অনেকটা হয়ে যায়।

স্বপ্নে স্নান করলে সর্দি হয়। স্বপ্নে রসগোল্লা খাচ্ছে, সন্দেশ খাচ্ছে। জোর করে খাওয়ার পরে হজম হয় না। পেট ফেঁপে যায়। 'ব্যাটা, তোর খাওয়া জোটে না। স্বপ্নে রসগোল্লা খাস কেন?' স্বপ্নে হিসি (প্রস্রাব) করে বলে, স্বপ্নে হিসি করতে ভাল লাগে। এইগুলোই বেশীরভাগ হয়। কাজেই স্বপ্নে আমাদের কাজ বেশী হয়, সুকাজ বেশী হয় না। স্বপ্নের রাস্তায় যদি তোমাদের পরিশ্রমটা ফেলতে পার, তার চেষ্টা কর। এটাই হল সবচেয়ে সুন্দর পথ।

কেন স্বপ্নের আসনের কথা বলা হল? কারণ শবাসনই বড় আসন। ঐ শবাসন সমাধিতুল্য হয়ে যায়। যেদিক দিয়েই যাও, তার মূল্য অমূল্য। এখানে বসেই অজ্ঞান হয়। আবার ট্রামে বসে বসেও অজ্ঞান হয়, নাক ডাকছে। ঘুমের মত সমাধিদেবতা এত সুন্দর সমাধি, সহজ সুন্দর সমাধি দিয়েছে, তোমরা কিন্তু ঘুমের মধ্যে নাকই ডাকাচ্ছ। ঘুমন্ত সমাধির পথ দিয়ে, স্বপ্নের পথ দিয়ে যদি আসতে পার, জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নের মাত্রার মধ্য দিয়ে যদি কাজ করতে

পার, দুর্গা, কালী আসবে। তোমাদের সঙ্গে কথা বলবে। তোমাদের ঠাকুরকেও দেখবে। সাধু-সন্ন্যাসী দেখবে। সেই পথ দিয়ে অনেক কে দেখতে পাবে। স্বপ্নের মাত্রায় একাগ্রচিত্তে মনন করলে, তবেই ঐ জিনিসের সাথে মিশতে পারবে। যেটা বিভূতি বল, সেইপথে সেটা সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পারবে এবং বিভূতি কিভাবে হয়, অতি সহজে বুঝতে পারবে। আজ এই থাক।

দেখ, কত পরিশ্রম করি। সকাল থেকে ১৮ ঘণ্টা, ১৯ ঘণ্টা জপ করতে আছি। বাচ্চা তো অনেক আছে। প্রত্যেকের জন্যই একটু একটু ছিটা-ফোঁটা দেওয়ার চেষ্টা করি। সবার জন্য কাজ করতে আছি। আমি যেন একটা আঁতুড় ঘরে বসে থাকি একভাবে। বাইরে গেলেও দর্শন দীক্ষা চলতে থাকে। না আছে চলাফেরা, না আছে কিছু। এরমধ্যে আছে আবার অশান্তি। তোমাদের স্থান দিতে পারি না। গুছাতে পারি না। তোমরা একটু কাজকর্ম কর। তোমরা আমার কাজের একটু সুবিধা করে দাও। দেখলে তো, শান্তি পাওয়া যায় না। **শান্তি সবাই চায়। 'এই দাও', 'সেই দাও' করে করে, আবহমান কাল ধরে শান্তি চাইতে চাইতে পায় শুধু অশান্তি।** এবার এ মরছে, তারপর ও মরছে। কারে তুমি মনে রাখবে, কারে তুমি ফেলবে। নারদ সংসার করতে গিয়েছিল। এই বাচ্চাটা ধরতে যায় তো, ঐটা চলে যায়। শেষ পর্যন্ত বউও গেল। ডুব থেকে বার বছর পর উঠলো। এমনই মহামায়ার প্যাঁচ। আমি যেমন এক সই করে, প্যাঁচে পড়েছি। তোমরাও মহামায়ার প্যাঁচে পড়েছ। যে জিনিস দিচ্ছি, কাজ কর। ওদের সঙ্গে (সন্তান দল) যোগাযোগ কর। মেম্বার যাতে হয়, তার চেষ্টা কর। কাজ কর। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

তোমরা জাগো। নাম কর, অযথা সময় নষ্ট করো না।

ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার, কলিকাতা
২৮শে এপ্রিল, ১৯৫৭

হো না যাতি হুঁ
ব্রহ্মাণাং যাতি হোং

শব্দই হচ্ছে ব্রহ্ম, আদি শব্দ হতেই সৃষ্টি হয়। শব্দের ভিতর দিয়েই সাড়া, শব্দের ভিতর দিয়ে সুর। শব্দের ভিতর তন্ময়তা আছে। শব্দব্রহ্মে তন্ময় হয়ে কাজ করতে হবে। কারণ সংসারের অবসান অনিবার্য। পথের সম্বল পাথেয় দরকার। সময় বড় সঙ্কীর্ণ। খুব গভীরভাবে নিবিষ্ট চিত্তে বসে যাও। গুরুর সান্নিধ্যলাভ, গুরুর উপদেশ, গুরুর শ্রীমুখ নিঃসৃতবাণী, এই নিয়ে যে থাকবে, তার কাছে সমস্ত অজানা জিনিস, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত জিনিস প্রস্ফুটিত হবে। কাজেই গুরুর সঙ্গত হচ্ছে বড় কথা। প্রকৃতির গ্রন্থই বড় গ্রন্থ। এই গ্রন্থপাঠ করতে হয়।

বাচ্চা শিশু যখন হারিয়ে যায়, তার মা চিৎকার করে; বাবা চিৎকার করে তার খোঁজ নেয়। শব্দ তেমনই জীবের খোঁজ নিচ্ছে। শব্দ জীবের সমস্ত সাড়া ও সুর নিয়ে কি করছে? শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে; প্রত্যেককে জানিয়ে দিচ্ছে তার নিজস্ব ঠিকানা। যেমন হারিয়ে গেলে, কোথায়? কোথায়? করে খোঁজে, এ সুরও তাই। গান বল, বাজনা বল, মন্ত্র বল, সব সেই হারানো সুর; হারানো জিনিস কোথায় গেছে? কোথায় গেলে তার দিশ মিলবে? সেটা মেলানোর জন্য, সেই ঠিকানায় পৌঁছাবার জন্য

এই শব্দ। এই শব্দ অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনমনে জেগে উঠছে। জীবের ভিতর এই শব্দ, সুর সবসময় প্রবাহিত হচ্ছে। এই শব্দ জীবগণকে সাবধান করছে; প্রত্যেককে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছে এবং বুঝিয়ে দিচ্ছে। কাজেই মনকে সবসময় বলবে, 'হে মন, তুমি সেইভাবে প্রবাহিত হও, যেভাবে গেলে সেই তত্ত্বের সাড়া পাও।' এই তত্ত্বের সুর ও সাড়া গভীরভাবে অন্তর্নিহিত রয়েছে আমাদের মাঝে। তার সাড়া বের করবার জন্য তত্ত্ব সবসময় এগিয়ে চলেছে।

বাচ্চা বয়স যখন ছিল, যা পেতাম, তাই নিয়ে ডাকতাম। কখনও আপনমনে উচ্চৈঃস্বরে নাম করতাম, কাঁদতাম। নিজের ভিতরে কান্নার রোল উঠতো। বনে জঙ্গলে একা একা ঘুরে ঘুরে যে সুর দিতাম, সেই সুরে নিজে গভীর তন্ময় হয়ে থাকতাম। তখন মনে হতো, এত বড় স্বাদ বোধহয় আর কিছুতে নেই। অনেক সাধু মহান চিৎকার করে শেষ করে ফেলেছেন সুরের জন্য। তারা কাঁদতেন, 'হে ঠাকুর, তুমি কোথায় লুকিয়ে আছ? এস, দর্শন দাও।' কেহ ১৬ নাম ৩২ অক্ষর, কেহ এমনি নাম, আবার কেহ বা নাম ছাড়া শুধু সুর নিয়ে আপনমনে তন্ময় হয়ে থাকতেন।

আমাদের দেশে গ্রামের বাড়ীতে শেষরাত্রে চৌকিদার গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় হাঁক দিত, 'বস্তিওয়ালা, খবরদার— জাগো।' আমিও বলি, 'তোমরা জাগো। নাম কর; অযথা সময় নষ্ট করো না।' এই জাগরণের সুরে, জাগরণের শব্দ নিয়ে, সবসময় তন্ময় থাকতো তারা।

মহাপ্রভু সবসময় আপনমনে নাম বিলিয়েছেন এবং নিজেও সবসময় জপ করতেন। তিনি নামে সবসময় ব্যস্ত ছিলেন।

বিশ্ববিরাটের সাথে প্রেমের যে স্তর, তন্ময়তার যে স্তর, নাম করতে করতে প্রেমের তন্ময়তায় মহাপ্রভু সেই সুরের সাথে নিজেকে মিশিয়ে দিতেন। তোমরা প্রাণভরে উচ্চৈঃস্বরে এই গীত শুধু করবে। এই সুরে মহাপ্রভু সবসময় এমন তন্ময় থাকতেন যে, কাঁদতেন আর বিভোর হয়ে বলতেন, 'হা ঠাকুর।' তাঁর অন্তর্নিহিত দেবতা কোথায় আছেন, এই ব'লে এই আকুলতায় শুধু কাঁদতেন, অহর্নিশ কাঁদতেন। তাঁর কান্নার মধ্যে যুক্তি ছিল, ভাব ছিল, ভক্তি ছিল, প্রেম ছিল। সেই কান্না কি? ভবসাগরের অশান্ত ভাব থেকে উত্তরণের (মুক্তির) জন্য কান্না। **সাগর থাকে শান্ত। সাগরের সৌম্য শান্ত ভাব থাকে। কিন্তু বাতাসের আন্দোলনে তার (সাগরের) উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেলে, তাকে উথাল-পাথাল করে তোলে। তখন সাগরের অশান্তভাব মনে ভীতির সঞ্চার করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাগরের প্রকৃতস্থ ভাব খুব সৌম্য শান্ত। সেইরূপ আমাদের এই দেহও একটা সাগর। এই দেহ সাধারণতঃ খুব শান্ত।** এই সাগরের (দেহের) ভিতরে তন্ময়তার সুর বইতে থাকে। কিন্তু সংসারের ঝড় এই দেহেতে যখন বয়ে যায়, তখন কি হয়? তখন সম্পূর্ণ অশান্তভাব হয়ে যায়। প্রবল ঢেউ খেলতে থাকে। এই ঢেউ হচ্ছে কান্নার রোল। ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদতে থাকে দেবতাকে স্মরণ করে, আর বলে, ''হে ঠাকুর, তুমি এসে এই ঢেউ থামায়ে দাও। তুমি আমার সম্মুখীন হও। আমার দেহে মনে একটা শান্তভাব এনে দাও।'' এই ভাবে মনের আকুলতা সৃষ্টি করে শুধু কাঁদতে থাকে।

এইভাবে চব্বিশ ঘণ্টা একটা মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। একটা নেশা— যেন আফিং-এর নেশা; সেই আফিং-এর নেশায় সবসময় ভরপুর থাকে। আহারে বিহারে সেই নেশা

থেকে সে এতটুকুনু বিচ্যুত হয় না। আফিং খাওয়াতে হয় না। নামের নেশা, জপের নেশায় বিভোর হয়ে থাকে। একটা ভাল খাবারের কাছ দিয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে যেমন জিহ্বায় লালা নির্গত হয়; আবার ঘৃণার বস্তুর সম্মুখীন হলে, আর একরূপ লালা আসে, সেটা ফেলে দেওয়া হয়। 'হ্যাক্ থুঃ' করে থুথু ফেলা হয়। সেটা গিলে খেলে পেটের অসুখ তো বটেই, কলেরা পর্যন্ত হতে পারে। তাহলে দেখা গেল, একই জিহ্বা হতে দুইরকম লালা নির্গত হলো। লালা কিন্তু এক জায়গা হতেই আসলো। একটাতে সুগন্ধ পেলে 'আঃ' করে গিলে ফেললে। আর একটা 'থুঃ' করে ফেলে দিলে। সুগন্ধযুক্ত লালাতে শরীরের পুষ্টি হয়, আর দুর্গন্ধযুক্ত লালা শরীরে প্রবেশ করলে শরীর অসুস্থ হয়।

দুর্গন্ধযুক্ত লালায় এমন একটা বিষ নির্গত হয় যে, চিন্তার সাথে সাথে দেহ বিষময় হয়ে যায়। আবার সুখাদ্যের চিন্তার সাথে সাথে দেহের পুষ্টিসাধন হয়ে যায়। অযথা আজে বাজে চিন্তায় মেজাজ খারাপ করলে, সেটা দেহের মধ্যে বিষময় হয়। দুর্গন্ধজাতীয় চিন্তা করলে, ওর থেকে লালা নির্গত হয়ে দেহ বিষময় হয়ে যায়। আবার সুচিন্তা হলে, সুচিন্তা করলে একটা সুস্পষ্ট ভাব হয় দেহে। দেহের ভিতর অজস্র জিহ্বা আছে। বিরাটের চিন্তার সাথে সাথে, জপ, তপ, ধ্যানধারণার সাথে সাথে তার থেকে লালা নির্গত হয়। সেই সুচিন্তার সাথে সাথে, যে লালা নির্গত হয়, সেই লালা সমস্ত দেহে ছড়িয়ে যায়। সেই তন্ময়ভাব এসে যখন উপস্থিত হবে, তখন ভিতরকার যন্ত্রগুলো ধারালো হবে।

আমাদের দেশে সুপারীর বন আছে। সুপারীর বাক্‌লা (ছাল) দিয়ে ধার দেয়। আবার মেটে পাতিলের উপরও ক্যাঁচ

ক্যাঁচ করে অস্ত্র ধার দেয়। দেহের ভিতরে অজ্ঞান, অন্ধকার বা না বুঝার যা কিছু আছে, সুচিন্তার ভাবজাতীয় বালিকণাতে ঐগুলি সব ধারালো হয়ে যায়। সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে সুচিন্তাগুলি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়। এই দেহযন্ত্রে সব কিছুই আছে।

মহাপ্রভু নাম করতেন। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে সব সময় নামে বিভোর থাকতেন। পাহাড় কেটে পথ করার যন্ত্র আছে না? সেই যন্ত্রে পাহাড় কেটে পথ বের করা যায়। হাতী শুঁড় দিয়ে ফোঁৎ ফোঁৎ, করে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে চলে। কারণ কুলের বীচিতে পা পড়লেই হাতী কুপোকাৎ। **আমাদের দেহের ভিতরেও হাতীর শুঁড়ের মতো জিনিস আছে, সেই শুঁড়ের সাহায্যে ভিতরের আবর্জনা দূর করে দেয়। ভাবে বিভোর হয়ে মহানামের সুর (যেন হাতীর শুঁড়) চর্চা করলে ফ্যাঁৎ ফুঁৎ করে অবুঝ আবর্জনা পরিষ্কার করে দেয়।** তুমি যেমন বাহ্য জগতের শব্দ কানে শুনছো, এই পরিদৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন বস্তুকে চোখে দেখছো, তেমনই নামে প্রেমে বিভোর হয়ে তিনি (মহাপ্রভু) শুনছেন। কি শুনছেন? বিরাটের বাঁশীর আওয়াজ, বিরাটের সুর তাঁর শ্রবণে (কর্ণে) এসে হাজির হয়। এই বাঁশীর সুর কেমন? ঠিক যেন নূপুরের আওয়াজ, নূপুরের বাজনা। নদীতে যখন বান আসে, নদীতে ডাক হয়, গর্জন হয়; বাতাসেতে বাড়ি (আঘাত) খেতে খেতে গর্জন হয়। ঠিক তেমনি এই বায়বীয় জগতে বস্তুতে বস্তুতে নিজেদের আলিঙ্গনে, একটা ভাবে ভাবে যখন গভীর ভাবের দিকে যেতে থাকে, নিজেদের একত্বে লীন হয়, সেই মিলনে একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ হয়, গর্জন হয়। সেই ধ্বনিতে, ধ্বনি-সঙ্গম কেন্দ্রে

মিলনের গুরুগম্ভীর ধ্বনি বেজে ওঠে। সবসময় শূন্যমার্গে স্বাভাবিকভাবে আপনমনে প্রবাহিত হচ্ছে সেই ধ্বনি। যে ধ্বনি শূন্যমার্গে বইছে, দেহের অভ্যন্তরে কি হচ্ছে? সেখানেও আছে সেই ধ্বনি।

বায়বীয় জগতে যে সমস্ত বস্তু আছে, দেহের অন্তঃস্থলেও সেইসব বস্তু সাজানো আছে। শক্তি যখন জাগতে থাকে, এই আওয়াজে আওয়াজে (ধ্বনিতে), সেই আওয়াজের সহিত এক আওয়াজে চলে যেতে থাকে, এক আওয়াজ হয়ে যায়। তখন একটা অদ্ভুত ভাব এসে যায়। এই line-এ যাঁরা আছেন, তাঁরা সবসময় এই নিয়েই বসে আছেন। তাঁরা এমন একটা ভাবরাজত্বে চলে যান যে, দর্শন, স্পর্শন স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যায়, চলার সাথে সাথে। এই যে ভাব, এর ভিতরে সুর শক্তি আছে, ধ্বনি আছে। কিন্তু এখন এখানকার এই ভাবের জলটা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই একটু ঘোলাটে হয়ে আছে। ইহা একটু পরিষ্কার করে নিলেই স্বচ্ছ টলটলে হয়ে যাবে। Refine করে (পরিষ্কার করে) আনো, স্বাদ হবে।

দেহের ভিতরে কি হচ্ছে? আমাদের ভিতর সবসময়, অহর্নিশ এই সুরধ্বনি বয়ে চলেছে। আমরা এখন ঘোলাটে মার্কা হয়ে আছি। গঙ্গাজলটা কাদামাখা—তাতে অনেক জীবাণু থাকে। দেহের ভিতরে সমস্ত ঘোলাটে হয়ে আছে। ইহা ক্রমশঃ ক্রমশঃ জপে, তপে, জ্ঞানে, ধ্যানে, সুরে, প্রেমে, ভক্তিতে এক এক ভাবে, এক এক ধাঁচে এসে উপস্থিত হয়েছে। তুমি যে ভাব পোষণ কর, সেই জাতীয় ভাব (ঘোলাটে ভাব) এসে, অসুস্থ করে দিচ্ছে। সেই ঘোলাটে ভাব পরিষ্কার করতে হবে। ঐ অসুস্থ ভাবকে সুস্থ করতে হলে, ধ্যানটা সেইমতো করতে হবে।

সেদিনকার কথা মনে হ'ল, যেদিন আমি উচ্চৈঃস্বরে নাম করতাম। যা পেতাম, তাই নিয়ে কাঁদতাম। কোথা থেকে কি আসতো, জানতাম না। শুধু কাঁদতাম। অদ্ভুত ভাল লাগতো।

বলতাম, 'আর তো পারছি না, ক্লান্ত হয়ে পড়ছি।' হা ঠাকুর, হা ঠাকুর করতাম না। কোন দেবদেবীর নাম ধরে ডাকতাম না। কারণ একজনকে ডাকতে গেলে, আর কেউ যদি চটে ওঠে, কি সাংঘাতিক। একজনের নামই ছিল 'বাবা'। সকলে তাকে 'বাবা' বলে ডাকতো। আমাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়। ছেলে বলবে, 'বাবা'। এটাই তো স্বাভাবিক। সুতরাং কারে কি বলা দরকার, কে চটলো, কে খুশী হলো— কোনটার মধ্যেই যাই নাই। আবার নিজেই হাসতাম। তখন মাঝে মাঝে বলতাম, 'পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি বসে বসে।' আবার একা একা দাঁড়িয়ে কথা বলতাম। **তুমি একজন ব্যক্তি—তুমি নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন করে যে উত্তর নিয়ে নিচ্ছ, এটা কিসের সাড়া? তুমি কাঁদছো, দুঃখ করছো। নিজে কেঁদে আবার আয়নায় নিজের কান্না দেখছো। রোগ, শোক, দুঃখ-ব্যথা, জ্বালা-যন্ত্রণা, একটা অতৃপ্তি, একটা কান্নাই আমরা প্রকারান্তরে অভ্যাস করে চলেছি।** আবার আয়নার সামনে দাঁত বের করে হাসো। গাল টিপি দিয়ে দেখ, কেমন দেখায়।

স্কুলে যখন পড়তাম, একটা ছেলের বাবা মারা গেছেন, সে মাগো, মাগো করে কাঁদতে লেগেছে। আগের দিন তার মাকে দেখেছি, ভাল ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোর মায়ের কি হয়েছিল?' সে বলে, 'মা নয়, বাবা মারা গেছেন।'

আমি বলি, 'দূর বেটা, মাগো, মাগো করে কাঁদছিস কেন? মা নয়, বাবা।'

সে একটা সুরে টান দিচ্ছে। সেই কান্নায় কি বুঝাচ্ছে? ভিতরকার উন্মাদনা, উচ্ছ্বাস, ব্যথা-বেদনা, সুপ্ত দুঃখ-শোক, এইভাবে বের করে দিচ্ছে; যেন ভিতরকার গ্যাস বের করে দিচ্ছে। শোকের কথা আলাপ করে পাঁচজনের সঙ্গে; নানান ভাবে কাঁদতে কাঁদতে এইভাবে হাল্কা হয়। ৫০০ বার কাঁদে, ৫০০ বার লোককে বলে মৃত প্রিয়জনের কথা। এটার সাথে সাথে ভাবে ভাবে দুঃখ-টুঃখ সব বেরিয়ে গেল। পরে আর কান্না আসে না। আবার শ্রাদ্ধ করবার জন্য অন্যমনস্কতা আসে। মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধশান্তি, খাওয়া-দাওয়ায় ব্যাপৃত থাকে; ব্যস্ত থাকে মনটা। কাজেই ধীরে ধীরে শোকের গভীরতা, পরে আর ততটা থাকে না। শুধু এই নয়, রোগ আছে, শোক আছে, সব আছে। দুঃখে হঠাৎ মারা যেতে পারে। সেজন্য মনকে ব্যস্ততার মধ্যে রেখে দেয়। কাজেই শোক আর ততটা থাকে না।

শোক তো বের করলো, আর একখানা তো বের হয় না। আর সব না হয় বের হয়। ভিতরকার সেই সুরটা কিভাবে বের হবে? রোগ, শোক, দুঃখ, যাতনার পর ভিতরকার সুর আপনি এসে যায়। নানান দুঃখ, কষ্ট, ঝামেলা সইতে সইতে মেজাজ এমন হয়ে যায়, তখন বলে, 'আর দরকার নেই।' হয়তো বনের মধ্যে চলে গেল সাধনা করতে। ভিতরে ভিতরে ভাবের রেশ খেলতে আরম্ভ করে। বেশীক্ষণ আবার থাকে না এইভাব। গাড়ীতে ধাক্কা দিতে দিতে ধাঁ ধাঁ করে ওঠে ও চলতে থাকে। প্রথমেই speed আসে না। সেক্ষেত্রে অভ্যাসের দরকার। নিন্দা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, এগুলো সাহায্য করে। তখন মনে হয়, 'হে মন, এবার বসে পড়। আর লাভ কি বাহ্যিক জিনিসে জড়িয়ে?' বৈরাগ্য এভাবে আস্তে আস্তে এসে ভিতরে জায়গা করে নেয়।

বৈরাগ্য আবার ডিম পাড়ে। তখন বিবেক,বিচার, বুদ্ধি ফোটে। যখন এক একটা ফুড়ুং ফুড়ুং করে ফাটে, ফুটতে আরম্ভ করে, তখন এক একজন এক এক লাইন নিয়ে বসে পড়ে। শত বললেও তখন বন্ধ করতে চায় না। সেটাই অভ্যাস হয়ে যায়। সেই ভাবের রাজত্বেই বিরাজ করতে থাকে।

ঐ যে দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম, অভিনয় করতে গিয়ে একজন চোখ-টেপার অভ্যাস করেছিল। সে চোখ টিপ দিত, ট্যারার পার্ট করতো। অভ্যাস করতে করতে এরকম হয়ে গিয়েছিল যে, যখন তখন চোখ টিপানি দিত। একদিন রাস্তায় এক মেয়েকে চোখ টিপ দিয়ে বসলো। তাকে ধরে থানায় নিয়ে গেল। চোখ মারার জন্য তিরস্কার করছে, সে আবার দারোগাকে চোখ টিপ দিয়ে বসলো। পুলিশকেও একখানা দিল। তখন থানার দারোগা খোঁজ নিল। লোকটার বাড়ীতে গিয়ে দেখে, অভিনয়ের অনেক ছবি আছে। ট্যারার ছবি, চোখ মারার ছবি সবই আছে। তখন লোকটা যে নির্দোষ মেনে নিয়ে তাকে ছেড়ে দিল।

তাই অভ্যাসের দ্বারা অনেক কিছু করা যায়। সুচিন্তা, সু-অভ্যাসের ফল সুদূরপ্রসারী। বিরাটের চিন্তা, বিরাটের সুরে ব্যাপৃত থাকলে স্বচ্ছতার সুরে মন ভরপুর হয়ে যায়। অভ্যাস যোগ বড় যোগ। বাচ্চা বয়স হ'তে মনকে যা অভ্যাস করাবে, মন তাই করবে। মহাশূন্যের ধ্যানে তন্ময় থেকে মহানামের সুর অভ্যাস কর। শব্দ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাও। তবেই সুফল ফলবে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমার শব্দ ব্রহ্মহাটের শব্দ। সেই শব্দ বা ধ্বনি Catch করে, তোমাদের কর্ণে জপ হিসাবে দিয়া দিলাম।

পুরী

২৭শে আগষ্ট, ১৯৫৩

অনন্ত মহাশূন্যে সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারায় যেদিন থেকে সৃষ্টি হ'ল, সেদিন থেকেই সৃষ্টবস্তু সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও হ'ল। প্রকৃতির আদর্শলিপি পাঠ করে, তার ধারাপাতা ধরে ধরে পথ চলতে হবে। জীবনে রোগ শোক দুঃখ-ব্যথার সাথে সাথে হতাশা, নিরাশা ও নানা বাধাবিপত্তি আসবেই। তাতে ভেঙে পড়লে চলবে না। আমরা কখনও ডুববো না। আমাদের বয়া হয়ে থাকার প্রচেষ্টা করতে হবে। **আমরা তেজের (জ্যোতির) সাধনা করছি। সর্ব অবস্থায়ই তেজ বিদ্যমান। রাগ, আনন্দ, দুঃখ সবই তেজের খেলা। জল, বাতাস, তাপ এই তিনের মিলনেই এক এক স্বরূপের সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।** এই তিন দিয়েই দুনিয়ার সৃষ্টি হল।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনন্ত বস্তুর সংমিশ্রণেই সৃষ্টি তাপের, জলের, বাতাসের। এই সমস্ত বস্তুর নাম অনন্ত; এরা অসীম। এদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সূক্ষ্ম শক্তি বা সূক্ষ্ম বস্তু, কোন মাপ দিয়ে বুঝা যায় না বা বিচার করা যায় না। ব্যাঘ্র, সেও সেই সূক্ষ্ম শক্তিতে ছিল। সেইরূপ যে কোনও জীব, মানুষ, কীট ইত্যাদি খুঁজলেও একই কথা। তাহলে তুমি, বাতাস, জল ও তাপের সমন্বয়েই তুমি গঠিত। তুমি বাতাসে আছ, জলে আছ,

তাপেতে আছ। বাতাস ছাড়া তুমি নও, জল ছাড়া তুমি নও, তাপ ছাড়া তুমি নও। তোমার যে এই সত্তা, তোমার যে এই সাড়া; কাজেই তুমি অনন্তে ব্যাপ্তমান। ১০০, ১ ছাড়া নয়। সেইরূপ তুমি দুনিয়ার যা সমস্ত দেখছ, শুনছ, সমস্ত নিয়েই তুমি অর্থাৎ জীব। জীব কথাটা ধর ১০০। খণ্ড খণ্ড নিয়েই তুমি, আবার সমস্ত খণ্ড একত্রিত করে, তারই নাম হয় অখণ্ড। যেমন লাবড়া তরকারী। লাবড়া তরকারী কি বুঝাতে, বাজারের দেশী বিদেশী সব তরকারী মশলার নাম করতে করতে, দুই ঘণ্টা কেটে গেল। জীবও সেইরূপ লাবড়া তরকারী। সমস্ত সত্তা নিয়ে, চৈতন্য নিয়ে, আলো, বাতাস, তাপ নিয়েই জীব। সব সত্ত্বেও লাবড়ার তরকারীতে একটু গরমিল, লবণ নাই। একটু লবণের দরকার, কাজেই সাগরে গেল। দামে তুচ্ছ লবণ; কিন্তু স্বাদের জন্য অপরিহার্য।

গুরুর সান্নিধ্যে তোমাদের স্বাদের মাত্রা বাড়ে। এই যে শ্মশান, এই যে মৃত্যু, প্রতিনিয়ত দেখছো চোখের সামনে, কেউ কি একটু অন্তর দিয়ে ভাবো? ঠিক তেমনি তুমি যে সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপ্তমান, এই ধ্বনি তো অন্তরের ধ্বনি হিসাবে ওঠে না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আগুনে হাত দিলে, আগুন ক্ষমা করবে না, হাত পুড়বেই। সেইরূপ তোমরা যদি সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপ্তমান সর্বদা চিন্তা কর, তোমাদের শক্তি বেড়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি যে সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপ্তমান বুঝতে না পারছো, ততক্ষণ তুমি ভরেই যাবে অর্থাৎ চিন্তা করেই যাবে। পেট না ভরা পর্যন্ত যেমন খেতে খেতে যাও, ঠিক তেমনই। ভরে যখন যাবে, তুমি সব বুঝতে পারবে, সব জানতে পারবে। নিদাঘের রাগে পুকুরের জল,

সমুদ্রের জল উড়ে যখন যায়, দেখা যায় না। আর একরকমের জানোয়ার আছে, নিজের মাংস নিজে খায়। সেইরূপ সর্বব্যাপ্তমান হলে, আমরাও নিজেরা নিজেদের খেয়ে যাচ্ছি। চিনি নিজের স্বাদ জানে না। তাই বলতে পারে না, সে মিষ্ট, বলি আমরা। কাজেই তোমরা সর্বজায়গায় সর্বভাবে আছ।

সব মহাপুরুষ একত্র হয়ে একজায়গায় বসলেন। তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন, 'এমন কি এক শব্দ আছে, যা বের করলে এবং তার রেওয়াজ করলে, যাকে (যে শব্দকে) আয়ত্ত করলে, তার প্রতি হুঁশিয়ার হলে, সবই পাওয়া যায়।' **মালিক অর্থাৎ গুরু তাই (সেই বীজমন্ত্র) তোমাদের দিলেন। টাকা বাড়াবার জন্য, ব্যবসার জন্য যেমন মূলধন দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি যে সম্পদ তোমাদের দেওয়া হয়েছে, যতবেশী আওড়াবে (রেওয়াজ করবে) তত বেশী সেই ধ্বনিতে ধনী হবে; মাত্রা বাড়বে, ব্যবসা বাড়বে এবং ততবেশী তোমরা সব বুঝতে পারবে।** তোমাদের মনরূপ সাগরে যে স্রোত বয়ে যাচ্ছে, অভাব-অভিযোগ, দারিদ্র্য দুশ্চিন্তা ইত্যাদির ঢেউ অনিষ্ট করার জন্য নয়; তোমাদের নূতন করে তৈরী করার জন্য। বাস্তবজীবনে রোগ শোক, দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য ইত্যাদি ঢেউয়ের আঘাতে আঘাতে, ধ্যানধারণার গভীর অর্থ চিন্তায়, মন্ত্রের ধ্বনিতে, মননের সুরে ভিতরের সুপ্ত মন্থনশক্তিকে বাড়িয়ে তোলো। তুমি যদি তোমার ভিতরে লীন হয়ে থাক, তবে তোমার ভিতরেই তোমার আস্তানা হয়। তোমার ভিতরের অজস্র অণুপরমাণু সেই বোলেই (ধ্বনিতেই) বোল দিতে থাকে।

মন্থনের যন্ত্র হচ্ছে মূলমন্ত্র। এই দুনিয়া শূন্যতেই অবস্থিত এবং সবাই প্রকারান্তরে শূন্যের চিন্তাই করে যাচ্ছে। শূন্য চিন্তা

করলে পূর্ণবেগে সব এগিয়ে আসবে। শূন্য চিন্তা করতে পারে না বলেই রূপের চিন্তা; তাই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ রূপে রূপে এত অপরূপ। সৃষ্টির কি কারিগরী। ভাবলে শুধু আশ্চর্যই হয়ে যেতে হয়। আবার রূপের চিন্তা করতে করতে শূন্যে লীন হয়ে যায়। 'হচ্ছে না,' 'হচ্ছে না' বারবার বলে যাচ্ছ। ততবেশী হয়ে যাচ্ছে। কেউ যদি বলে, 'আমি ছেলের কথা মনে করবো না,' বারবার বললে আরও বেশী করে মনে করা হয়ে যায়।

একজন সকাল হতে দুর্বা বাছছে, আর 'হা ঠাকুর,' 'হা ঠাকুর' বলে আক্ষেপ করছে। ঘুমের মধ্যে ঠাকুর বলেন, 'চিন্তা কেন তোর, প্রতিটি দুর্বার মধ্যে আমি আছি।' দুর্বাই বাছুক, গাছই আনুক আর ছালই আনুক, সবই মন্দিরের ভিতরে দেবতার পূজার জন্য। একত্বের, এক অখণ্ডের খণ্ড খণ্ড রূপ কেবল। যে কোন রূপেই যাও না, তুমি তোমার রূপকেই পূজা করছো। এই একই হচ্ছে মূল, এটাই তোমার আস্তানা। নিজের আস্থা যদি ঠিক হয়, স্থান তখনই আসে। তখনই তুমি আস্তানা পাচ্ছ।

হারমোনিয়ামে সব সুরই আটক আছে সাত/আট পর্দায়; দুনিয়ার সব সুর সেরূপ তোমার ভিতর মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার, এই সপ্তচক্রে বাঁধা আছে। এই সপ্তচক্রের সুর যে সাধতে পারে, সেই সফলতার দিকে যাচ্ছে। হারমোনিয়াম যে বাজাতে জানে না, সুরের মর্মও সে বোঝে না। তোমাদের ভিতরে এখন বেশীরভাগ পর্দা বেসুরে আছে। তোমাদের এখন সুরসাগরে সুর সাধা দরকার। সব বেসুরকে সুরে আনার চেষ্টা করবে। সাধার অবস্থা যখন আছে তোমাদের ভিতর, বসে বসে সাধবে একটু।

দূর হতে বাজারের বিভিন্ন জিনিসের চাহিদার মিলিত ধ্বনি শুনা যায়, সেটা একটা 'গুম্ গুম্' ধ্বনি। একান্ত নিকটে না এলে কোন কথাই আলাদা ভাবে শোনা যায় না প্রায়। হাট বাজারের ঐ শব্দ মুষ্টিমেয় কয়েকটি শব্দ মাত্র। সেইরূপ ১০,০০০ জিনিসের চাহিদার ঐ মিলিত শব্দ ধর, 'টম'। একজন জপ হিসাবে 'টম' আওড়িয়ে সিদ্ধিলাভ করে ফেললো। চাই তেজপাতা, চাই লবণ, চাই গোলমরিচ, তা হ'তে এইসব শব্দ বের হলো।

আমার শব্দ ব্রহ্মহাটের শব্দ। তার গুম্ গুম্ ধ্বনি—চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র অসীম অনন্ত। সেই ধ্বনি বা শব্দ catch করে তোমাদের কর্ণে জপ হিসাবে, দিয়া দিলাম। তোমাদের ভিতরে 'ফাটবে' যখন, তখন তোমরা ব্রহ্মহাটের সব জিনিস পেয়ে যাবে। অন্তর্যামিত্ব, অদৃশ্য হওয়া (vanishing), ১ সেকেন্ডে সব জায়গায় বিরাজ করা, ২০ লাখ পৃথিবী ১ সেকেন্ডে সৃষ্টি করা, কয়েক লাখ সূর্যের power-এর একটা টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পরা ইত্যাদি ক্ষমতাগুলি তোমার আয়ত্তে এসে যাবে। ব্রহ্মহাটের এইসব জিনিস তুমি আনতে পারবে তোমার ঘরের ভিতর। বাজার হতে যেমন ডাব, নারকেল এনে ঘর ভর্ত্তি করো। ঘর যেন তবুও ভরে না। তবে যতবেশী সাধবে সুরসাধনা করবে, ঘর তত ভরবে। যে সুর সাধতে দিয়েছি, যে ধ্বনি কর্ণে দিয়েছি, যত সাধবে, সপ্তচক্রে বাঁধা থাকবে, ইহাও মনে রাখবে। যে বিশ্রাম লোকে চায়, সেটা প্রকৃত বিশ্রাম নয়। শয্যাশায়ী রোগী যেমন চায় না, আর শুয়ে থাকা বিশ্রাম।

যতই শান্তি শান্তি করো, অশান্তি তৈরী না করলে আবার চলে না। এত যে অশান্তি, তবুও তো লোক হাসে, খেলে।

অশান্তি মানে তাপ। তাপই সব টেনে আনে। সেটাই যোগ, প্রাণায়াম, কুম্ভক, রেচক প্রভৃতি।

শিশুর ইন্দ্রিয় বশে থাকে না বলেই, শিশু যতক্ষণ খুশী হাসে বা কাঁদে। ইন্দ্রিয় আয়ত্তে আছে যাঁর, সে এমন করে না। শিশুর এরূপ করার কারণ, তার ইন্দ্রিয় এখনও শিথিল রয়েছে। আমাদের মনের চঞ্চলতা, বিক্ষিপ্ততা সেইরূপ শিশুর অবস্থা। কর্দমাক্ত অবস্থা আবার অনেক ভাল। ইচ্ছামত ছাঁচে ফেলে তৈরী করতে পারা যায়। তোমাদের ভিতরও সাজ (ছাঁচ) আছে। সাজ মানে ব্রহ্মসাজ। একটু সাধলেই ফুটে উঠবে।

সহস্র সহস্র রূপ নিয়ে যা বের হয়, তাই সহস্রার। সহস্র সূর্যের কিরণ নিয়ে তোমাদের সহস্রারও বিকশিত হয়ে উঠবে।

গুরু কি করেন, দেখতে যাবে না। গুরু যা বলেন, সেই আজ্ঞা পালন করতে চেষ্টা করবে। সূর্যমুখী ফুলের মতো মনটাকে গুরুমুখী করে রাখবে। তবেই সফলতা অনিবার্য।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আজ মহাকাশের মহাস্বরগ্রাম ‘রাম নারায়ণ রাম’ তোমাদের হাতে তুলে দিলাম

১৫৫, পার্কষ্ট্রীট, কলকাতা (রাত ১১টা ৩৫ মিঃ) ।
২৮শে জুলাই, ১৯৬৮, রবিবার, বাংলা ১১ই শ্রাবণ, ১৩৭৫

(ঘরোয়ানা পরিবেশে কয়েকজন আবাসিকের সামনে ‘রাম নারায়ণ রাম’ মহানাম সম্পর্কে পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই মহামূল্যবান আলোচনাটি করেছিলেন, সকলের অবগতির জন্য সেটিই যথাসম্ভব যথাযথভাবে তুলে ধরা হ’ল।)

এতদিন তোমরা যে নাম সংকীর্তন করে আসছো, মহাপ্রভু এই নামের মধ্য দিয়ে সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন এনেছিলেন। তিনি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিলিয়েছিলেন এই ১৬ নাম ৩২ অক্ষর ‘হরেকৃষ্ণ হরেরাম’ মহানামের ধ্বনি। হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচার করতে গিয়ে তাঁকে অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। তাঁর ভক্তরাও সেই নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আজও মহাপ্রভু জনমানসের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলে আজও তিনি সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু সেই শত্রুরা আজ কোথায়?

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রক্তের মর্যাদা রক্ষাকল্পে তাঁরই মাতুলবংশের শেষ রক্ত হিসাবে এই অভাগা (শ্রীশ্রীঠাকুর) আজ

তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। বেশ অনেকদিন ধরে মহাশূন্যের এক পরিচিত ধ্বনি মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, এটা যেন শুভ একটা কিছুর ইঙ্গিত। **এতদিন তোমরা যে নাম সংকীর্ত্তন করে আসছো, সেই ১৬ নাম ৩২ অক্ষর ‘হরেকৃষ্ণ হরেরাম’ নামের সারবস্তু সারমর্ম হিসাবে মহাকাশের মহা স্বরগাম ‘রাম নারায়ণ রাম’ তোমাদের হাতে তুলে দিলাম।**

আজ চারিদেকে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সমাজ সংসারে, তার থেকে একমাত্র মুক্তির পথ হচ্ছে, মহাকাশের এই মহা স্বরগ্রাম ‘রাম নারায়ণ রাম’। তোমরা এই মহানাম ঘরে ঘরে প্রচার করবে। **এরজন্য তোমাদের অনেক বাধা-বিপত্তি, অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন, তির্যক মন্তব্য শুনতে হবে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তোমাদের জয় অনিবার্য।** আমার আর্শীবাদ তোমাদের সঙ্গে রইল। আগামী ক্লাসগুলোতে এই মহানামের উপর আলোচনা করা হবে। আজ এই থাক। সবাই বল, ‘রাম নারায়ণ রাম’। ‘রাম নারায়ণ রাম’। ‘রাম নারায়ণ রাম’।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

* **‘রাম নারায়ণ রাম’ মহানামের প্রথম রেকর্ড হয়, ইং ১৪ই মে, সোমবার, ১৯৭৩ সাল। বাং ৩১শে বৈশাখ, ১৩৮০ সাল। HMV স্টুডিওতে চিত্ত বর্ধনের তত্ত্বাবধানে এই মহানামের প্রথম রেকর্ড হয়।**

** **শ্রীশ্রীঠাকুর এর আগে বিভিন্ন ঘরোয়া ক্লাসে মাঝে মধ্যে ‘রাম নারায়ণ রাম’ মহানামের উল্লেখ করে ভাষণ শেষ করতেন। এই বিষয়ে ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৬৭ (২৮, ল্যান্সডাউন টেরেস, কলকাতা - ২৬) প্রদত্ত ভাষণটির উল্লেখ করা যেতে পারে।**

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা, S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯, ৯৪৭৪৩৪৮৭৭১
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) বীরেন্দ্র দর্শন, জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোল-৫, ফোন- ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) বেদধাম, ইছাপুর, উঃ ২৪-পরগণা, মোঃ- ০৯৪৩৩৯৫৯১৩৮
৮) কোলকাতা বইমেলা।
৯) জলধর সাহা, সেক্রেটারী সন্তান দল, মেঘালয়, মোঃ- ৯৪৩৬১১২৬০১
১০) বলরাম, ৩৪ এস.কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮, মোঃ- ৯৮৩৬৬৯৯৪৪৮
১১) Lakshindhar Das, Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১২) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন, লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৩) সুভাষ ঘোষ, বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন - ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৪) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন - ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৫) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, আসানসোল, ফোন - ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৬) মধুসূদন মৈত্র পুরুলিয়া, ফোন - ০৯৮৩১৬১১৬৮৪
১৭) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা, ফোন - ৯০০৭০৭৫১৯৯
১৮) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
১৯) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
২০) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
২১) বিভাস চক্রবর্ত্তী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ০৯৬৪৭৭৯২৫২২
২২) ভোলানাথ দাস, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪
২৩) তপন / অনিমা গাঙ্গুলী, মানকুন্ডু, হুগলী, ফোন - ২৬৮৫-৬১৪৬
২৪) কালিপদ চক্রবর্ত্তী, পাখানজোড়, ছত্রিশগড়, মোঃ- ৯৪০৬০০১৫৭২
২৫) গনেশ রায়, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ৯৭৪৯০৯০১৮২
২৬) বেদ অভেদ ধাম, হরে কৃষ্ণ, আলিপুরদুয়ার জং, মোঃ- ৯৪৩৪২০৪৫৯০
২৭) ইতি বর্মন, দিনহাটা, কোচবিহার, মোঃ- ৯৯৩২৬৩৯৬৩৯
২৮) ভগীরথ সাহা (ভগু), গোয়ালাপট্টি, কোচবিহার, মোঃ- ০৯২৩৩২৩৭৬৬৬
২৯) আর.এন.আর এন্টারপ্রাইজ, ফোন - ২৪৪০-৯১৫১
৩০) ডঃ সুধাংশু দত্ত, মালিগাঁও, গুয়াহাটি, আসাম, ফোন - ০৯৪৩৫১৯০৭৮১

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

	পুস্তক পরিচিতি	প্রকাশকাল
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬)	১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭)	বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮)	শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯)	তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০)	দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১)	পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২)	অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩)	বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪)	সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫)	পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬)	জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭)	মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮)	আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯)	কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০)	জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১)	তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২)	মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩)	পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪)	চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬
২৫)	মনই সৃষ্টির উৎস	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬
২৬)	সাধু হও সাবধান	শুভ মহালয়া, ১৪১৬
২৭)	লং পাহাড়ের ডায়েরী	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৬
২৮)	বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদ	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯
২৯)	যত্র জীব তত্র শিব	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৬
৩০)	ম্যাসেঞ্জার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৭
৩১)	আলোর পথিক	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৭
৩২)	নাদ ব্রহ্ম	শুভ রাখী পূর্ণিমা, ১৪১৭

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫